হিতোপদেশ

পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তর



হিতোপদেশ

নারায়ণ বিরচিত

হিতোপদেশ

পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

মূল সংস্কৃত থেকে ভাষান্তর

ডঃ মুরারিমোহন সেন

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ / ১৩৯১
আগস্ট / ১৯৮৪

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

বারো টাকা

Complete HITOPADESH

নারায়ণ

হিতোপদেশ



মিত্রলাভ

প্রস্তাবিকা

যে মহেশ্বরের মস্তকে চন্দ্রকণা বিরাজিত তাঁরই অনুগ্রহে সজ্জনগণ তাঁদের ঈপ্সিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করুন।

এই হিতোপদেশ পাঠ করলে সংস্কৃত-উক্তিতে নৈপুণ্য এবং সকল ক্ষেত্রেই বাক্যের বৈচিত্র্য জন্মে; তাছাড়া এই গ্রন্থ নীতিবিদ্যাও দান করে।

মানুষের জরা নেই, মৃত্যু নেই—এই ভেবে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যা ও অর্থোপার্জনের কথা চিন্তা করবেন; আর মৃত্যু এসে যেন তার কেশধারণ করেছে এই ভেবে ধর্মাচরণ করবেন।

সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ, কেননা কেউ তা অপহরণ করতে পারে না, তা অমূল্য এবং ক্ষয়হীন।

দুরতিক্রমণীয় সমুদ্র যেমন রাজকে ভাগ্যের পথে পরিচালিত করে, তেমনি নীচ-গামিনী নদীর মতোই বিদ্যা মানুষকে ভাগ্যের অধিকারী করে।

বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয়গুণেই মানুষ যোগ্যতার অধিকারী হয়; যোগ্যতা থাকলে ধন আয়ত্ত হয়, ধন থেকে ধর্ম, ধর্ম থেকে সুখ।

শস্ত্রবিদ্যা এবং শাস্ত্রবিদ্যা—দুই-ই কীর্তিলাভের উপায়; প্রথমটি অর্থাৎ শস্ত্র-বিদ্যা বার্ধক্যে বিদ্রূপের কারণ হয়ে ওঠে কিন্তু শাস্ত্রবিদ্যা সকল সময়েই আদৃত হয়।

যেমন কাঁচা পাত্রে দাগ দিলে তা মোছে না, তেমনি বাল্যকালে যে সংস্কার অর্জিত হয় তা দূরীভূত হয় না, এই জন্যে আমি গল্পচ্ছলে বালকদের কাছে নীতিশাস্ত্রের কথা বলব।

পঞ্চতন্ত্র এবং অন্য একটি গ্রন্থ থেকে আহরণ করে আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি, মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি—এই চারভাগে তা বিভক্ত।

ভাগীরথী তীরে এক নগর—নাম পাটলিপুত্র। সেখানে সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন—তিনি ছিলেন সমস্ত প্রভুগুণের অধিকারী। সেই রাজা একদিন শুনতে পেলেন কে একজন দুটি শ্লোক পড়ছে—যার অর্থ—

শাস্ত্র সকল সংশয় দূর করে, দৃষ্টির বহির্ভূত বিষয়ও দর্শন করায়, শাস্ত্র সকলের চক্ষুস্বরূপ—এই শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে তো অন্ধ।

যৌবন, ধনসম্পদ, প্রভুত্ব এবং বিবেকহীনতা—এদের মধ্যে একটিই বিপদের কারণ, চারটি একত্র হলে তো কথাই নেই।

এই শ্লোক শুনে রাজা এই ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন—তার নিজের পুত্রেরাও তো শাস্ত্র-জ্ঞানহীন এবং উচ্ছৃংখল; তিনি ভাবলেন—

যে পুত্র বিদ্বান বা ধার্মিক নয় তার জন্মগ্রহণে কিসের সার্থকতা? চোখ যার কানা সে কেবল চক্ষুপীড়াই ভোগ করে।

অজাত, মৃত এবং মূর্খ—এই তিনের মধ্যে প্রথম দুটি বরং ভালো, শেষেরটি নয়।

প্রথম দুটি একবার দুঃখ দেয় আর মূর্খ পুত্র দুঃখ দেয় পদে পদে। তাছাড়া–

যে জন্মগ্রহণ করলে বংশের উন্নতি ঘটে তার জন্মই সার্থক। এই পরিবর্তনশীল সংসারে মৃত ব্যক্তিও তো পুনরায় জন্মগ্রহণ করে থাকে।

গুণীজনের গণনার সূচনাতেই যার নাম কনিষ্ঠ আঙুলে প্রথম না পড়ে তার মাতা যদি পুত্রবতী তবে বন্ধ্যা কার নাম ?

দানে, তপস্যায়, শক্তিতে যার যশ প্রসারিত হয় নি, বিদ্যালাভে অর্থলাভ হয় নি সে তার মাতার মলস্বরূপ। আর একটি কথা–

শত মূর্খ অপেক্ষা একটি গুণী পুত্র ভালো ; একাকী চাঁদ অন্ধকার দূর করে, নক্ষত্রপুঞ্জ তা পারে না।

কোথাও কোন পুণ্যতীর্থে যিনি অতিদুষ্কর ব্রত পালন করেছেন তার পুত্রই বশীভূত, সমৃদ্ধ, ধার্মিক এবং পণ্ডিত হয়ে থাকেন।

অর্থলাভ, এবং সেই সঙ্গে প্রতিদিন রোগের অভাব যদি থাকে, ভার্যা যদি অনুগতা এবং প্রিয়বাদিনী হয়, পুত্র বশীভূত এবং বিদ্যা যদি অর্থকরী হয়– তাহলে এই ছয়টিকেই সংসারের সুখের হেতু বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।

যারা শস্যের গোলায় একটি বিশেষ মাপের মতো শুধু সংখ্যাই পূরণ করে থাকে এমন অনেক পুত্রে কে সুখী হয় ? তার চেয়ে কুলের অবলম্বন স্বরূপ একটি পুত্রই বরণীয়–যার গুণে পিতা খ্যাতিলাভ করেন।

ঋণকারী পিতা শত্রু, ব্যভিচারিণী মাতাও শত্রু, রূপবতী ভার্যা শত্রু আর মূর্খ-পুত্রও শত্রু।

নিয়মিত অনুশীলিত না হলে বিদ্যা বিষস্বরূপ, অজীর্ণ রোগে ভোজন বিষ, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে সভাও বিষতুল্য, বৃদ্ধের কাছে তরুণী ভার্যাও বিষ।

যে কোন পিতা-মাতা থেকে প্রসূত হোক না কেন, পুত্র যদি গুণবান হয় সে-ই পূজিত হয়ে থাকে ; বিশুদ্ধ বংশে নির্মিত ধনুতে যদি গুণ আরোপিত না হয় তবে সেই ধনুতে কী প্রয়োজন ?

হায় বৎস, তুমি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করেছ, বিগত রাত্রিগুলোতে কোন জ্ঞান আহরণ কর নি, তাই বিদ্বৎসভায় এসে তুমি কষ্ট পাচ্ছ–পঙ্কে নিমগ্ন হয়ে গাভী যেমন ক্লিষ্ট হয়ে থাকে।

তবে কোন্ উপায়ে আমার এই পুত্রদের আমি গুণবান করে তুলব ? কারণ–

ভোজন, নিদ্রা, ভয় ও স্ত্রীসম্ভোগ–এ সব পশু বা মানুষ উভয়েই করে থাকে ; এদের মধ্যে প্রভেদ শুধু ধর্মাচরণে ; বস্তুত, ধর্মবোধহীন মানুষ পশুরই সমান।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ–এদের মধ্যে একটিও যে অর্জন করতে পারে নি (অর্থাৎ যে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে নি, সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে নি, ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে কামোপভোগ করে নি এবং মুক্তির সাধনা করে নি) তার জন্ম অজার গলস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ডের মতোই নিরর্থক।

এই কথা বলা হয়ে থাকে–আয়ুষ্কাল, কর্ম, প্রকৃতি, বিত্ত ও বিদ্যার পরিমাণ এবং মৃত্যুর সময়–এই সব ব্যাপার মানুষ গর্ভে থাকবার সময়েই স্থির করা হয়।

যা ঘটবেই তা মহতের ক্ষেত্রেও অবশ্যই ঘটবে। দেখ না, নীলকণ্ঠ নগ্ন হয়ে আছেন, বিশাল সর্প-শয্যায় শয়ন করে আছেন বিষ্ণু।

তাছাড়া 'যা হবার নয় তা কোন কালেই হবে না, যা হবে তার কোন দিন অন্যথা হবে না।'–এই সিদ্ধান্তই তো চিন্তাবিষের মহৌষধ–লোকে এ ঔষধ কেন পান করে না?

কার্যে যারা অক্ষম এ জাতীয় অলস উক্তি তাদেরই। দৈবের কথা ভেবে নিজের উদ্যোগ ত্যাগ কোরো না। বিনা উদ্যোগে তিল থেকে তৈল লাভ হয় না।

তাছাড়া, যে পুরুষসিংহ উদ্যোগী হন, লক্ষ্মী তাকেই অনুগৃহীত করে থাকেন। দৈবের প্রভাব নষ্ট করে আত্মশক্তিতে পৌরুষ প্রকাশ কর। যত্ন সত্ত্বেও যদি সিদ্ধিলাভ না হয় তবে কিসের দোষ?

যেমন একটি চাকায় রথ চলতে পারে না তেমনি পুরুষকার ছাড়া দৈব সফল হয় না।

যাকে দৈব বলা হয় তা আসলে পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের সমষ্টি মাত্র। তাই পুরুষকারের সাহায্যে অনলসভাবে যত্ন করে যেতে হবে।

যেমন মৃৎপিণ্ড থেকে মানুষ ইচ্ছামতো রূপ নির্মাণ করে, তেমনি নিজের কৃত কর্মফলই ভোগ করে।

আকস্মিকভাবে কোন রত্ন সামনে পড়ে থাকলেও দৈব তা হাতে তুলে দেয় না–সে পুরুষকারের প্রতীক্ষা করে।

কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারাই কোন কার্য সিদ্ধ হয় না, যেমন নিদ্রিত সিংহের মুখে পশু প্রবেশ করে না।

মাতা পিতার প্রযত্নের গুণে পুত্র গুণার্জন করতে পারে। গর্ভ থেকে বিচ্যুত হয়েই কেউ পণ্ডিত হয় না।

পুত্রকে শিক্ষা না দিলে বলতে হবে মাতা শত্রু, পিতাও শত্রু, হংস মধ্যে যেমন বক শোভা পায় না, তেমনি সেই পুত্রও সভায় শোভা পায় না।

রূপ ও যৌবন থাক, বিশাল বংশে জন্ম হোক, বিদ্যাহীন হলে গন্ধহীন পলাশের মতোই তারা শোভা পায় না।

বস্ত্রসজ্জিত হয়ে মূর্খও সভায় শোভিত হতে পারে কিন্তু এই শোভা ততক্ষণ যতক্ষণ সে কথা না বলে।

এই সব চিন্তা করে সেই রাজা পণ্ডিত-সভার আয়োজন করলেন। (সভায়) রাজা বললেন–হে পণ্ডিতগণ, শুনুন, আমার পুত্রগণ সর্বদাই উন্মার্গগামী, তারা শাস্ত্রপাঠে বিমুখ। (এখানে) এমন পণ্ডিত কি কেউ আছেন যিনি এদের এমন ভাবে নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করতে পারেন যাতে এদের পুনর্জন্ম হয়? কারণ, কাচও স্বর্ণসংযোগে মরকতের দীপ্তি লাভ করে–সেই রকম সৎসংসর্গে মূর্খও প্রবীণতা লাভ করে।

এই রকম বলা হয়–হীন ব্যক্তির সংসর্গে বুদ্ধি হীন হয়, সমান ব্যক্তির সংসর্গে বুদ্ধি সমতা লাভ করে, বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তির সংসর্গে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।

তখন সকল নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিষ্ণুশর্মা নামে এক মহাপণ্ডিত (দ্বিতীয়) বৃহস্পতির ন্যায় বলতে লাগলেন–দেব, এই রাজপুত্রগণ বিশাল বংশসম্ভূত। আমার মনে হয় আমি এদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে পারব। কেননা, অযোগ্য পাত্রে বিহিত কর্ম কখনও সফল হয় না; শত চেষ্টাতেও বককে শুকের মতো পাঠ করতে শেখানো যায় না।

আর একটি কথাও ভাবতে হবে—এই বংশে নিগুর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করতে পারে না ; পদ্মরাগমণির খনিতে কাচের উদ্ভব কীভাবে সম্ভব ?

সুতরাং আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করব।

রাজা আবার তাঁকে সবিনয়ে বললেন—পুষ্পের সংসর্গে কীটও সৎলোকের মস্তকে স্থান পায় ; মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শিলাখণ্ডও দেবত্ব লাভ করে।

তাছাড়া, উদয়গিরিস্থ দ্রব্যসমূহ সূর্যের নিকট সংসর্গে দীপ্যমান হয়—তেমনি সৎ-এর সংসর্গে সামান্য ব্যক্তিও দীপ্তি লাভ করে।

গুণজ্ঞের কাছেই গুণ 'গুণ' বলে গৃহীত হয়—নিগুর্ণের কাছেই গুণ দোষ স্বরূপ। জন্মকালে নদীর জল সুপেয় কিন্তু সমুদ্রে গিয়েই তা হয় পানের অযোগ্য।

তাহলে আমার এই পুত্রদের নীতিশাস্ত্র উপদেশের ব্যবস্থা আপনিই করুন। এই বলে তিনি বিষ্ণুশর্মার হাতে সসম্মানে পুত্রদের সমর্পণ করলেন।

প্রস্তাবিকা সমাপ্ত

তারপর প্রাসাদপৃষ্ঠে যখন রাজপুত্রেরা সুখে উপবিষ্ট, তখন সেই পণ্ডিত ভূমিকা হিসেবে তাদের বললেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কাব্য এবং শাস্ত্রপাঠের আনন্দ উপভোগ করে, মূর্খ ব্যক্তি সময় কাটায় নিদ্রায়, কলহে কিংবা কুক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে।

তোমাদের আনন্দ বিধানের জন্যে আমি কাক, কূর্ম এবং অন্যদের বিচিত্র কাহিনী বলব। রাজপুত্রেরা বলল—আর্য, আপনি বলুন। বিষ্ণুশর্মা বললেন—শোন। এখন আরম্ভ হচ্ছে 'মিত্রলাভ'। কাক, কূর্ম, মৃগ এবং মূষিক—এদের উপকরণ ছিল না, ধনও ছিল না—কিন্তু এরা পরস্পরের পরম বন্ধু এবং বুদ্ধিমান—তাই এরা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পেরেছিল।

রাজপুত্রেরা বললে—কীভাবে তা সম্ভব হল ? বিষ্ণুশর্মা বললেন—

গোদাবরী তীরে ছিল এক শাল্মলীগাছ। বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন স্থান থেকে পাখিরা রাত্রিতে এসে সেখানে বাস করত। একদিন রাত্রি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পদ্মবল্লভ চন্দ্র যখন অস্তাচল আশ্রয় করেছেন তখন একটি কাক জেগে উঠল—তার নাম লঘুপতনক ; সে দেখল এক ব্যাধ দ্বিতীয় মৃত্যুদেবতার মতোই সেই দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে সে ভাবল, আজ প্রভাতেই 'অমঙ্গল' দেখলাম। কে জানে কোন্ অশুভ ঘটবে! এই ভেবে সে ব্যাকুল হয়ে তাকে অনুসরণ করল। কেননা—সহস্র সহস্র শোকের কারণ, শত শত ভয়ের উপলক্ষ্য মূর্খ ব্যক্তিকেই অভিভূত করে থাকে, পণ্ডিতকে নয়। তাছাড়া—

সংসারী লোকের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই করা প্রয়োজন—প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই তাকে বুঝে নিতে হবে—এক ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত—স্থির করতে হবে মৃত্যু, রোগ বা শোকের মধ্যে কোন্‌টি তার অদৃষ্টে আছে।

তারপর সেই ব্যাধ চালের কণা ছড়িয়ে দিয়ে জাল বিছিয়ে দিল—নিজে রইল আড়ালে। সেই সময় কপোতরাজ চিত্রগ্রীব সপরিবারে আকাশপথে উড়ে যাবার সময় সেই চালের কণাগুলি দেখতে পেলেন। কপোতের দল চালের কণা দেখে লুব্ধ হয়েছিল—তাই দেখে কপোতরাজ বললেন—এই নির্জন বনে চালের কণা কীভাবে আসবে ? তাই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার ; আমি মঙ্গল কিছু দেখতে

পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এই চালের কণার লোভে আমাদেরও সেই রকম অবস্থা হবে, সেই যে কঙ্কণের লোভে লুব্ধ পথিক গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হয়ে বৃদ্ধ বাঘের হাতে প্রাণ হারাল—সেই পথিকেরই মতো। কপোত বলল—কী রকম ? সে বলতে লাগল—

কথা ॥ এক

একবার দক্ষিণারণ্যে বিচরণ কালে আমি দেখলাম—এক বৃদ্ধ বাঘ স্নান করে কুশ হাতে নিয়ে সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে বলছে—ওহে পথিকগণ, এই সুবর্ণ কঙ্কণ নাও।

লোভে আকৃষ্ট হয়ে এক পথিক ভাবল—ভাগ্যবশেই এ রকম ঘটে থাকে। কিন্তু নিজের যেখানে জীবনের আশঙ্কা রয়েছে সেখানে এমন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত হবে না। কারণ—

অনিষ্ট বস্তু থেকে ইষ্ট বস্তু লাভ হলেও পরিণাম শুভজনক হয় না। বিষের সঙ্গে জড়িত থাকলে অমৃতও মৃত্যুর কারণ হয়।

কিন্তু সর্বত্র অর্থার্জনে শঙ্কা থাকবেই। লোকে বলে—

সংশয় অতিক্রম না করে কেউ মঙ্গল দেখতে পায় না, সংশয়ে থেকে সে যদি বেঁচে থাকে তবেই সে মঙ্গলকে দেখতে পাবে।

তাহলে একবার সন্ধান নিতে হচ্ছে। প্রকাশ্যে সে বলল—

তোমার কঙ্কণ কোথায় ? বাঘ থাবা খুলে দেখাল। পথিক বলল—তুমি হিংস্র, তোমাকে কী করে বিশ্বাস করব ? বাঘ বলল—হে পথিক, তুমি শোন, আগে যখন আমার যৌবন ছিল, আমি ভীষণ দুর্বৃত্ত ছিলাম ; অনেক গোরু, মানুষ বধ করেছি (সেই পাপে) আমার পুত্র, স্ত্রী সবাই মারা গিয়েছে। তখন এক ধার্মিক ব্যক্তি আমাকে আদেশ করলেন—তুমি দানধর্ম পালন কর। কারণ—

যজ্ঞ, বেদপাঠ, দান, তপস্যা, সত্য, ধৈর্য, ক্ষমা আর নির্লোভতা—স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই আটটি ধর্মাচরণের পথ।

এদের মধ্যে প্রথম চারটি 'লোক-দেখানো' হিসেবেও পালন করা যেতে পারে, পরের চারটি একমাত্র মহাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখা যায়।

এই নির্লোভতা আমার মধ্যে এত বেশি যে নিজের হাতে বেশ নিরাপদে আছে, তবু এই সুবর্ণ কঙ্কণ যাকে হোক তাকে দিয়ে দিতে চাই। তবু বাঘে মানুষ খায় এই লোক-প্রচলিত নিন্দা কিছুতেই দূর করা গেল না। কারণ—

যে সব লোক অন্ধভাবে একে অন্যের অনুকরণ করে, তারা ধর্মচারিণী কোন বারবনিতাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে না—যেমন তারা করে থাকে গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণকে।

আমি ধর্মশাস্ত্রও পড়েছি। শোন—মরুতে যেমন বর্ষণ সার্থক, ক্ষুধার্তকে প্রদত্ত খাদ্য যেনন সার্থক, দরিদ্রকে দান করলেও, হে পাণ্ডুনন্দন, সেই দান তেমনি সফল হয়ে থাকে।

নিজের কাছে প্রাণ যেমন প্রিয়, অন্য প্রাণীদের কাছেও তাদের প্রাণ তেমনি প্রিয়। নিজের সঙ্গে তুলনা করে সাধু ব্যক্তিগণ প্রাণীদের দয়া প্রদর্শন করেন। তাছাড়া—

দানে-প্রত্যাখ্যানে, সুখে ও দুঃখে, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে নিজের সঙ্গে তুলনা

করেই মানুষ তার আদর্শ স্থির করে নিতে পারে।

আরও দেখ, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ, সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যিনি দেখেন তিনিই পণ্ডিত।

তোমার অত্যন্ত দুর্দশা তাই তোমাকেই (এই কঙ্কণ) দেওয়ার জন্যে আমার এত আগ্রহ। এই রকম বলা হয়ে থাকে—হে কৌন্তেয়, দরিদ্রকে ধন দাও, ধনীকে দিও না। যে ব্যাধিগ্রস্ত, ঔষধ তার পক্ষেই উপকারী, নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে ঔষধের কী প্রয়োজন ? আর একটি কথা—

যে প্রত্যুপকার করে ঋণ শোধ করতে পারে না—উপযুক্ত কালে ও স্থানে, এমন যোগ্য পাত্রে যা দেওয়া হয় তাকেই বলে সাত্ত্বিক দান।

তাহলে এই সরোবরে স্নান করে সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ কর। তারপর সে যখন তার কথায় বিশ্বাস করে লোভের বশে সরোবরে স্নান করতে নামল, তখন পাঁকের স্তূপে আটকে গেল ; পালাতে পারল না। পাঁকে আটকে যেতে বাঘ বলল—আহা, গভীর পাঁকে পড়ে গেছ দেখছি। তাহলে আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে আসছি। এই বলে বাঘ ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল। বাঘ যখন ধরল, তখন পথিক ভাবল—ধর্মশাস্ত্র পড়ছে অথবা বেদ অধ্যয়ন করছে এই বলেই দুরাত্মাকে বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। এ সব ব্যাপারে স্বভাবধর্মটাই বড় কথা। গোদুগ্ধ তো স্বভাবতই মধুর।

তছাড়া, যারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, তাদের কাজ হস্তিস্নানের মতোই অর্থহীন—এ যেন কুরূপা রমণীর অঙ্গে অলঙ্কার।

সুতরাং এই হিংস্র প্রাণীকে বিশ্বাস করে আমি ভালো কজ করি নি। লোকে বলে নদী, শস্ত্রপাণি, নখরবিশিষ্ট, শৃঙ্গবিশিষ্ট, নারী এবং রাজবংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অসঙ্গত।

কোন লোকের স্বভাবই পরীক্ষা করে দেখা উচিত, অন্যান্য গুণ নয় ; কেননা, অন্যান্য গুণ অতিক্রম করেই স্বভাবের প্রতিষ্ঠা।

আর একটি কথাও চিন্তনীয়। সেই তিমিরহারী গ্রহগণের মধ্যচারী, সহস্রকিরণধারী চন্দ্রদেবকেও তো বিধিবশে রাহু গ্রাস করে—কপালে যা লেখা তা খণ্ডন করবে কে ?

এই সব কথা যখন সে ভাবছিল তখনই বাঘ তাকে ধরে খেয়ে ফেলল।

(কপোতরাজ চিত্রগ্রীব বললেন) তাই আমি বলছিলাম, কঙ্কণের লোভে পথিকের মৃত্যুর কথা। মোট কথা, বিচার না করে কোন কাজ করা উচিত নয়। কেননা, সুজীর্ণ অন্ন, বিচক্ষণ পুত্র, সংযতা নারী, সুসেবিত নৃপতি, উত্তমরূপে বিচার করে যে কাজ নিষ্পন্ন হয় বা বলা হয়—দীর্ঘকালেও এ সবের কোন বিকৃতি ঘটে না।

এ কথা শুনে একটি কপোত উদ্ধতভাবে বলল—আঃ, কেন এ সব কথা বলা হচ্ছে ? আপৎকালেই বৃদ্ধের বচন শুনে চলতে হয় ; সব ব্যাপারেই শুনতে গেলে আমাদের খাওয়া পর্যন্ত ঘুচে যাবে। কেননা—

সব কিছুই তো শঙ্কায় ঘেরা—অন্ন, পান সব কিছু। তাহলে কোন্ পথে চেষ্টা চলবে, কেমন করেই বা জীবনধারণের ব্যবস্থা হবে ?

ঈর্ষাপরায়ণ, ঘৃণাযুক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্রোধস্বভাব, নিত্যশঙ্কিত এবং পরভাগ্যোপজীবী—এই ছয় শ্রেণীর লোকই দুঃখভাগী হয়ে থাকে।

এ কথা শুনে সেই কপোতেরা এসে সেখানে (তণ্ডুলকণার উপরে) বসল। কারণ, যারা মহৎ শাস্ত্রের প্রণেতা, যারা সংশয় নিরসন করতে পারেন তারাও লোভে বিচলিত হলে সংকটের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাছাড়া–

লোভ থেকে অশান্তির উদ্ভব হয়। লোভ থেকেই জাগে ভোগের কামনা। লোভ থেকেই আসে মোহ এবং শেষে ধ্বংস। লোভ পাপের মূল।

আর একটি কথাও চিন্তনীয়–স্বর্ণমৃগের অস্তিত্ব অসম্ভব জেনেও রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগের জন্যে লুব্ধ হয়েছিলেন। প্রায়ই দেখা যায়, বিপদ যখন সামনে তখনই মানুষের বিচারশক্তি মোহাচ্ছন্ন হয়েছে।

তারপর সবাই জালে বন্ধ হল। তখন যার কথায় বিশ্বাস করে তারা সেখানে নেমে এসেছিল, তাকে সবাই তিরস্কার করতে লাগল। কারণ, দলের আগে কারও যাওয়া উচিত নয় ; যদি কাজ সফল হয়, সকলেই তার সমান অংশভাগী, আর যদি ব্যর্থ হয়, নেতার প্রাণই বিনষ্ট হয়ে থাকে।

সেই তিরস্কার শুনে চিত্রগ্রীব বলল–দোষ এর নয়। কারণ, বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে তখন বন্ধুজনও নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকেন। গোবৎসকে বেঁধে রাখার সময় মাতৃজঙ্ঘাই বন্ধনস্তম্ভের কাজ করে। তাছাড়া–

যে বিপন্নকে সংকট থেকে রক্ষা করতে পারে সে-ই বিপন্নের বন্ধু–কতটুকু সুষ্ঠু-ভাবে করা হয় নি বা কোন কাজের সময় অতীত হয়ে গেছে–এই সব নিন্দা-বচনে যে দক্ষ সে কখনও বন্ধু নয়।

বিপৎকালে বিচলিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। সুতরাং এই বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ–বিপদে ধৈর্য, সম্পদে ক্ষমা, সভাস্থলে বাক্‌পটুতা, যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম, যশে লিপ্সা এবং অধ্যয়নে অনুরাগ–এ সবই মহতের লক্ষণ।

সম্পদে যার হর্ষ হয় না, বিপদে যিনি বিমর্ষ হন না, যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন না ত্রিভুবনের তিনি তিলকস্বরূপ ; এমন পুত্রের যিনি জন্মদান করেন সেই মাতা দুর্লভ।

এই সংসারে যে মঙ্গল কামনা করে, ছয়টি দোষ তাকে ত্যাগ করতে হবে–নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা।

এই ক্ষেত্রেও তোমাদের এই রকম করা উচিত। তোমরা একসঙ্গে সবাই মিলে জালসুদ্ধ উড়ে যাও। কেননা–ক্ষুদ্র প্রাণীদেরও সংহতি কার্যসাধন করতে পারে। ক্ষুদ্র তৃণ পাকিয়ে রজ্জু প্রস্তুত করে মদমত্ত হস্তীকেও বেঁধে রাখা চলে।

ক্ষুদ্র হলেও নিজবংশীয় লোকজনের সঙ্গে ঐক্য কার্যসাধন করতে সমর্থ ; সামান্য ছাড়িয়ে নিলেই তণ্ডুল থেকে আর গাছ জন্মায় না।

এইরূপ চিন্তা করে পাখিরা সকলেই জাল নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। তারপর, ওরা জাল অপহরণ করে চলে যাচ্ছে–দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে সেই ব্যাধ পিছনে পিছনে ছুটে গেল। সে ভাবল–

এই পাখিরা একত্র হয়ে আমার জাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। যখন ওদের মধ্যে বিবাদ বাধবে তখন ওরা আমার বশীভূত হবে।

সেই পাখিরা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল, ব্যাধও ফিরে এলো। ব্যাধকে ফিরে যেতে দেখে কপোতেরা বলল–এখন কি করা উচিত ? চিত্রগ্রীব বলল–

মাতা, বন্ধু, পিতা–এরা স্বভাবতই হিতকারী ; অন্যেরা কার্যকারণবশত হিতবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে থাকেন।

এখন, আমাদের বন্ধু মূষিকরাজ হিরণ্যক গণ্ডকীতীরে যে চিত্রবন আছে, সেইখানে থাকে। সে-ই আমাদের বন্ধন মোচন করবে। এই আলোচনা করে তারা হিরণ্যকের গর্তের সামনে গেল। হিরণ্যক আবার সব সময়ে বিপদের আশঙ্কা করত বলে একটা 'বিবর' তৈরি করেছিল–তার একশো পথ ; সেই বিবরেই সে থাকত।

হিরণ্যকও এতগুলো কপোতের পতন দেখে ভয়ে চকিত হয়ে চুপ করে রইল। চিত্রগ্রীব বলল–সখে হিরণ্যক, তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলছ না কেন? তখন হিরণ্যক তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে লাফিয়ে বাইরে ছুটে এলো। সে বলল–আঃ, আমার কী আনন্দ ; এ যে বন্ধু চিত্রগ্রীব !

যার বন্ধুর সঙ্গে সংলাপ, বন্ধুর সঙ্গে বাস, বন্ধুর সঙ্গে কথা—এই সংসারে তার চেয়ে পুণ্যবান আর কে ?

এদের পাশবন্ধ দেখে সে বিস্মিত হল ; কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল–সখে, এ সব কী ? চিত্রগ্রীব বলল–সখে, এ আমাদের পূর্বজন্মের কৃত পাপের ফল।

কারণ, উপায়, রীতি, সময় বা শ্রেণী যা-ই হোক না-কোন কাজ, তা যে কোন স্থানেই মানুষ সম্পাদন করুক না কেন, ভালো হোক, মন্দ হোক তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে বিধাতৃনির্দিষ্ট রীতি অনুসারেই।

রোগ, শোক, তাপ, বন্ধন ও সংকট–এগুলো মানুষের রোপিত অপরাধ-বৃক্ষের ফল।

এই কথা শুনে হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে গেল। চিত্রগ্রীব বলল–বন্ধু, এমন কাজ কোরো না। এরা আমার আশ্রিত, আগে এদের বন্ধন মোচন কর, পরে আমাকে মুক্ত কোরো। হিরণ্যক বলল–আমার শক্তি অল্প, আমার দন্তও জীর্ণ–তবে এদের বন্ধন ছেদন করব কী ভাবে? তাই যতক্ষণ আমার দাঁত না ভেঙে যায় ততক্ষণ তোমারই বন্ধন ছিন্ন করি। তারপরে এদের বন্ধনও যতদূর সম্ভব ছেদন করা যাবে। চিত্রগ্রীব বলল–তা ঠিক। কিন্তু তা হলেও তুমি যথাশক্তি এদের বন্ধনই মোচন কর। হিরণ্যক বলল–নিজের জীবনের বিনিময়ে আশ্রিতপালন নীতিবিদ্‌গণ সমর্থন করেন না। কারণ–

সংকট থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে অর্থ সঞ্চয় করা উচিত, ধনের বিনিময়ে স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত। স্ত্রী এবং ধনের বিনিময়ে নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

আর একটি কথাও চিন্তনীয়–ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের যথাযথ পরিপালনের জন্যেই তো জীবন। সেই জীবনকে যে ত্যাগ করে–কী সে ত্যাগ করে না? সেই জীবনকে যে রক্ষা করে কী সে রক্ষা করে না ?

চিত্রগ্রীব বলল–সখে, নীতিশাস্ত্রের উপদেশ তাই বটে। কিন্তু আমি আশ্রিতদের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না, তাই এ কথা বলছিলাম। কারণ, যিনি প্রাজ্ঞ তিনি ধন এবং জীবন পরের জন্যে উৎসর্গ করেন। মৃত্যু যেখানে অবধারিত সেখানে কোন মহৎ উপলক্ষ্যে ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

আর একটি বিশেষ কারণও আছে–জাতি, দ্রব্য ও গুণের বিচারে ওরা আমার সমান। আমি যে ওদের প্রভু তার ফল আমি কবে কীভাবে পেতে পারি ? তাছাড়া–

বেতন না পেলেও এরা আমার সঙ্গ ত্যাগ করে না। তাই, আমার প্রাণের

বিনিময়েও আমার আশ্রিতদের বাঁচাও। আর একটি কথা–

সখে, আমার যশ তুমি বাঁচিয়ে রাখ ; মাংসমূত্রপুরিষ ও অস্থিতে নির্মিত এই নশ্বর দেহের চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও।

আর ভেবে দেখ, যদি এই অনিত্য এবং মলবাহী দেহের বিনিময়ে নির্মল ও চিরস্থায়ী যশের অধিকারী হওয়া যায়–তবে কী লাভ করা হল বল ! কারণ–

দেহ ও গুণের মধ্যে অনেক পার্থক্য । দেহ ক্ষণস্থায়ী, গুণ কল্পান্তস্থায়ী।

এ কথা শুনে হিরণ্যক হৃষ্ট মনে সহর্ষে বলে উঠল–সাধু, সখে সাধু ! এই আশ্রিত বাৎসল্যগুণে তুমি ত্রিলোকেরও প্রভুত্ব লাভের যোগ্য। এ কথা বলে সে সকলেরই বন্ধন মোচন করল। তারপর হিরণ্যক সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলল–সখে চিত্রগ্রীব, এই যে তোমার জালে বন্ধন, এ ব্যাপারে দোষী ভেবে নিজেকে অপরাধী মনে কোরো না। কারণ, যে-পাখি শত যোজনের অধিক দূরত্ব থেকেও নিজের শিকারকে লক্ষ্য করে সে-ও সময় এলে পাশ-বন্ধন দেখতে পায় না। তাছাড়া–

রাহু ও কেতু কর্তৃক চন্দ্র সূর্যের পীড়ন, হস্তী ও সর্পের বন্ধন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির দারিদ্র–এ সব দেখে আমি ভাবি, অদৃষ্টই বলবান। আরও দেখ–

আকাশের এক প্রান্তে বিচরণ করতে করতে পাখিরা বিপন্ন হয়ে পড়ে, অগাধসলিল সমুদ্র থেকেও দক্ষ ধীবর মাছ ধরে। এই সংসারে দুষ্কর্ম বা পুণ্যকর্মেরই বা কিসের সার্থকতা ? নিষ্ঠুর বিধি সংকটের হাত প্রসারিত করে দূর থেকেই (মানুষকে) অধিকার করে (অভিভূত করে)।

এই ভাবে তাকে উৎসাহিত করে, অতিথি সেবা করে তাকে আলিঙ্গন করল। তারপর সে তাকে ইচ্ছামতো স্থানে যেতে বলল। হিরণ্যকও নিজের বিবরে প্রবেশ করল।

যার সঙ্গেই হোক শত শত মৈত্রীবন্ধন হওয়া প্রয়োজন। দেখ, মূষিক বন্ধুর সাহায্যে কপোতের দল বন্ধন থেকে মুক্ত হল।

এখন এই সমস্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল লঘুপতনক নামক সেই কাক ; সে বিস্মিত হয়ে ভাবল–হে হিরণ্যক, তুমিই প্রশংসার যোগ্য। তাই আমিও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি। সুতরাং অনুগ্রহ করে আমাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ কর।

এ কথা শুনে হিরণ্যক তার গর্ত থেকেই বলল–তুমি কে ?

সে বলল–আমি এক কাক, নাম লঘুপতনক।

হিরণ্যক হেসে বলল–তোমার সঙ্গে কেমন করে বন্ধুত্ব হতে পারে ? কারণ–

এই পৃথিবীতে যে যার যোগ্য, পণ্ডিত ব্যক্তি তার সঙ্গেই তাকে যুক্ত করে থাকেন। আমি খাদ্য, তুমি খাদক–এ ক্ষেত্রে প্রীতি কী করে সম্ভব ? তাছাড়া–

খাদ্য ও খাদকের মধ্যে প্রীতি বিপদেরই কারণ হয়ে ওঠে। শৃগালের কৌশলে পাশে বদ্ধ হল সেই মৃগ–তার প্রাণ রক্ষা করল এক কাক।

কথা ॥ দুই

মগধ দেশে ছিল এক বিশাল অরণ্য–নাম চম্পকবতী। সেখানে দীর্ঘকাল গভীর প্রীতির সূত্রে এক মৃগ আর এক কাক বাস করত। সেই মৃগ ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াত, তাই ক্রমে ক্রমে তার দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল।

কোন এক শৃগাল একদিন তাকে দেখতে পেল–সে ভাবল–আঃ, কী করে এর নধর মাংস ভক্ষণ করব। যা হোক, আগে তো বিশ্বাস উৎপাদন করি। এই কথা ভেবে সে কাছে গিয়ে বলল–এই বন্ধু! ভালো আছ তো? এই বনে বন্ধুহীন অবস্থায় আমি মৃতবৎ বাস করছি। এখন তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে, মনে হল যেন বন্ধুর সঙ্গে জীবলোকে প্রবেশ করলাম। আমি এখন সর্বভাবে তোমার অনুচর হয়ে থাকব।

মৃগ বলল–তাই হোক।

তারপর মরীচিমালী ভগবান সূর্য যখন অস্তমিত হলেন, তারা দুজনে মিলে মৃগের বাসস্থানে গেল। সেখানে চম্পক বৃক্ষের শাখায় সুবুদ্ধি নামে সেই কাক বাস করত–সে মৃগের চিরকালের বন্ধু। তাদের দুজনকে দেখে কাক বলল–সখে চিত্রাঙ্গ, এই দ্বিতীয়টি কে? মৃগ বলল–এ এক শৃগাল; আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করে এসেছে। কাক বলল–বন্ধু! আগন্তুকের সঙ্গে সহসা বন্ধুত্ব করা সঙ্গত নয়। (শাস্ত্রে) বলা হয়েছে–

যার কুলশীল (বংশ বা চরিত্র) কিছুই জানা নেই তাকে আশ্রয় দেওয়া অনুচিত। মার্জারের দোষেই (শেষ পর্যন্ত) মারা গেল সেই জরদ্গব নামক গৃধ্র।

তারা দুজনে বলল–কী রকম? কাক বলতে লাগল–

কথা ॥ তিন

ভাগীরথীর তীরে ছিল গৃধ্রকূট নামক এক পর্বত–সেই পর্বতে ছিল এক বিশাল পাকুড় গাছ; সেই গাছে জরদ্গব নামে এক গৃধ্র বাস করত, বার্ধক্যের জন্য তার নখ ও নয়ন জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অনুকম্পাবশত সেই বৃক্ষবাসী পক্ষীরা তার জীবন ধারণের জন্য নিজেদের খাদ্য থেকে কিছু কিছু দিত। তাতেই তার জীবন নির্বাহ চলত। এই ভাবেই সে বেঁচে ছিল। বিনিময়ে সে ওদের শাবক রক্ষা করত।

তারপর একদিন দীর্ঘকর্ণ নামে এক বিড়াল সেখানে এলো–উদ্দেশ্য পক্ষীশাবক ভক্ষণ। তাকে আসতে দেখে পক্ষীশাবকগুলি ভয়ার্ত হয়ে কোলাহল শুরু করে দিল। তা শুনে জরদ্গব বলল–কে আসছে? গৃধ্রকে দেখে দীর্ঘকর্ণ সভয়ে বলে উঠল–হায়, গেলাম বুঝি এবার। যা হোক–

ভয়ের কারণ যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই ভীত হওয়া চলে; কিন্ত সেই কারণ এসে গেলে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

এর কাছে এসে পড়েছি, এখন তো পালাতেও পারব না। তাই যা হবার তা-ই হোক; এখন এর বিশ্বাস উৎপাদন করে কাছেই যাই। এই রকম ভেবে কাছে গিয়ে বলল–আর্য! আপনাকে অভিবাদন করি! গৃধ্র বলল–তুমি কে? সে বলল–আমি এক বিড়াল। গৃধ্র বলল–দূরে চলে যাও, নইলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব। বিড়াল বলল–আমার কথাটা আগে শুনুন। তারপর যদি আপনার মনে হয়, আমাকে বধ করা উচিত, তখন বধ করবেন। কারণ–

শুধু জাতি বিচারেই কি কেউ কখনও বধ্য বা পূজ্য বলে বিবেচিত হয়েছে? চরিত্র জেনেই বধ্য বা পূজ্য বিবেচিত হয়ে থাকে।

গৃধ্র বলল–কেন এসেছ বল!

সে বলল–এখানে গঙ্গাতীরে নিত্য স্নান করে ব্রহ্মচর্য পালন করি–এই ভাবে চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালন করে যাচ্ছি। এ সব পাখি তো বিশ্বাসের পাত্র–এরা সব সময়ে আমার কাছে বলে থাকে–আপনি ধর্মশাস্ত্রপাঠে রত। আপনি বিদ্যায় ও বয়সে প্রবীণ; আপনার কাছে ধর্মকথা শুনতে এখানে এসেছি আর আপনি এতই ধর্মজ্ঞ যে, আমি অতিথি, আমাকেও বধ করতে উদ্যত হয়েছেন! গৃহস্থের ধর্ম তো এই ঃ

শত্রুও গৃহে এলে অভ্যর্থনা করা উচিত; যে ছেদন করতে এসেছে–গাছ তার কাছ থেকে ছায়া গুটিয়ে নেয় না।

যদি ধন না থাকে প্রীতিবচনেও অতিথি সৎকার করা যেতে পারে। কারণ–

তৃণ, ভূমি, জল, সত্য ও প্রিয় বচন–সজ্জনের গৃহে এগুলির অভাব হয় না।

তাছাড়া, গুণহীন ব্যক্তিদেরও সজ্জন দয়া করে থাকেন। চাঁদ চণ্ডালের গৃহ থেকে তার জ্যোৎস্না সংকুচিত করে না। আর একটি কথা–

ব্রাহ্মণের কাছে গুরু হলেন অগ্নি, অন্য সকল বর্ণের কাছে ব্রাহ্মণই গুরু, নারীর নিকটে তার পতি গুরু, অতিথি সকলের নিকটে গুরু।

অতিথি যার গৃহ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়, তার পাপ তাকে সমর্পণ করে পুণ্য আহরণ করে নিয়ে যায়। তাছাড়া–

উত্তমবর্ণের কাছে নীচবর্ণের কেউ এলেও তাকে যথাযোগ্যভাবে সম্বর্ধনা জানানো উচিত। কারণ অতিথি হলেন সর্বদেবতার সঞ্চিত রূপ।

গৃধ্র বলল–বিড়াল স্বভাবতই মাংসপ্রিয়;

এখানে পক্ষীশাবকেরা থাকে, তাই এভাবে বলছিলাম–। এ কথা শুনে সেই বিড়াল মাটি স্পর্শ করে কান দুটি স্পর্শ করল; তারপর বলল–ধর্মশাস্ত্র শুনে আমার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে বলেই আমি এই দুষ্কর চান্দ্রায়ণব্রত পালন করছি। ধর্মশাস্ত্রগুলি পরস্পর কলহে রত কিন্তু একটি বিষয়ে তারা একমত–সেটি এই যে অহিংসাই পরম ধর্ম। কারণ–যারা সকল রকম হিংসা থেকে নিবৃত্ত, সবকিছু সহ্য করতে সমর্থ আর যারা সকলের আশ্রয়স্বরূপ তারাই স্বর্গে যান।

ধর্মই হল একমাত্র বন্ধু। ধর্ম মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়। অন্য সবকিছু দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়।

আর একটি কথা–একজন অন্যের মাংস খাচ্ছে–দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা দেখ; একজনের ক্ষণিক তৃপ্তি, অন্যের প্রাণ গেল। তাছাড়া–

যে লোক মরতে যাচ্ছে তার যে দুঃখ তা অন্যে বর্ণনা করতে পারে না।

আরও, শোন–বনে স্বভাবের নিয়মে যে শাক উৎপন্ন তাতেই তো উদরের তৃপ্তি ঘটে; কে এই অভিশপ্ত উদরের জন্যে জঘন্য পাপ করতে যাবে?

এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করে সেই বিড়াল তরুকোটরেই থাকতে লাগল।

দিন যায়। সেই বিড়াল প্রত্যহ পক্ষীশাবকগুলিকে আক্রমণ করে কোটরে এনে ভোজন করতে লাগল। যাদের সন্তানদের সে খেতে শুরু করল তারা শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগল। এদিক ওদিক তাদের জিজ্ঞাসা শুরু হল। বিড়াল ব্যাপারটা জানতে পেরে কোটর থেকে বাইরে পালিয়ে গেল। পরে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে পাখিরা তরুকোটরে শাবকদের অস্থি দেখতে পেল। এরপর 'এই জরদ্গবই আমাদের সন্তান ভক্ষণ করেছে'–এই স্থির করে তারা গৃধ্রকে মেরে ফেলল। তাই আমি বলছিলাম–যার কুলশীল

জানা নেই তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

এই কাহিনী শুনে সেই শৃগাল সক্রোধে বলে উঠল—মৃগের সঙ্গে আপনার যেদিন প্রথম দেখা হল, সেইদিন আপনিও তো 'অজ্ঞাতকুলশীল'ই ছিলেন—তাহলে আপনার সঙ্গে তার সস্নেহ ভাব কী করে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে?

যেখানে বিদ্বান নেই সেখানে 'ক্ষুদ্রবুদ্ধি'ও প্রশংসা পায়; যে দেশে বৃক্ষ নেই সেখানে এড়ণ্ডবৃক্ষও গৌরব লাভ করে। তাছাড়া—

এই ব্যক্তি আমার আত্মীয়, এই ব্যক্তি আমার পর—ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিরাই এই সব বিবেচনা করেন। যারা উদারচিত্ত তাদের কাছে তো সমস্ত পৃথিবীই আত্মীয়।

এই মৃগ যেমন আমার বন্ধু তেমনি আপনিও। মৃগ বলল—এই বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কী? আমরা সবাই বন্ধুর মতো প্রীতিপূর্ণ আলাপের মধ্যে বসবাস করি।

কারণ—কেউ কারও বন্ধু নয়, কেউ কারও শত্রু নয়, শত্রু বা বন্ধু চেনা যায় ব্যবহারের দ্বারা।

কাক বলল—তাই হোক। তারপর তারা সকলেই তাদের ইচ্ছামতো স্থানে চলে গেল।

একদিন গোপনে শৃগাল মৃগকে বলল—সখে, এই বনের একপ্রান্তে একটি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে। তোমাকে আমি তা দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই রকমই করা হল; সেই মৃগও সেখানে গিয়ে শস্য খেতে লাগল। তারপর ক্ষেত্রপতি তা দেখে একদিন পাশযোজনা করল।

তারপর আবার এসে মৃগ জালে বন্ধ হল। সে ভাবল—মৃত্যুর বন্ধনতুল্য এই ব্যাধের জালবন্ধন থেকে বন্ধু ছাড়া আর কে আমাকে বাঁচাতে পারবে? সেই সময়ে শৃগাল সেখানে উপস্থিত হল; সে ভাবল—কপট চক্রান্তের সাহায্যে আমার কামনা এবার পূর্ণ হতে চলেছে। যখন একে কাটা হবে তখন মাংস ও রক্তে লিপ্ত এর হাড়গুলি নিশ্চয়ই আমি পাব; তাতে আমার প্রচুর পরিমাণেই ভোজন হবে।

মৃগ তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল—আমার বন্ধন ছিন্ন কর, শীঘ্র আমাকে বাঁচাও। কারণ—

বিপদে মিত্রকে জানা যায়, যুদ্ধে বীরকে, সাধু ব্যক্তিকে ঋণে। ভার্যাকে চেনা যায় সম্পদের ক্ষয়ে আর আত্মীয়-স্বজনকে জানা যায় বিপদের মুহূর্তে। তাছাড়া—

উৎসবের আনন্দে, বিপদের দুর্দিনে দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে বা শ্মশানে যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে সে-ই যথার্থ বান্ধব।

শৃগাল বার বার জালের দিকে তাকাল; সে ভাবল, বন্ধনটা দৃঢ়ই বটে। বলল—সখে, এই জাল তো স্নায়ুনির্মিত; তাই আজ রবিবারে এগুলোতে দাঁত ছোঁয়াব কেমন করে? তুমি যদি অন্য কিছু মনে না কর, তাহলে কাল সকালে তুমি যা বলবে, তাই করব।

এই বলে তার কাছে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সেই কাক সন্ধ্যাকালেও হরিণ এলো না দেখে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে তাকে সেই অবস্থাতে দেখতে পেল। সে বলল—সখে, এ কী? হরিণ বলল—বন্ধুর বাক্য অবহেলা করেছিলাম, এ তারই ফল।

এ তো লোকে বলেই থাকে—হিতকামী বন্ধুদের কথা যে শোনে না, তার বিপদ সন্নিকট—সে শত্রুর আনন্দবর্ধন করে।

কাক বলল–কোথায় সেই প্রতারক? হরিণ বলল–আমার মাংসের লোভে এইখানেই আছে কোথাও। কাক বলল–আমি তো আগেই বলেছিলাম–

'আমি কোন অপরাধ করি নি'–এই উক্তিই (দুর্জনের প্রতি) বিশ্বাসের কারণ হতে পারে না। গুণী ব্যক্তিরাও দুর্জনকে ভয় করে থাকেন।

যার মৃত্যু সন্নিকট সে নির্বাপিত প্রদীপের ঘ্রাণ পায় না, বন্ধুর বাক্য শোনে না এবং অরুন্ধতী তারাকেও চোখে দেখে না।

যে মিত্র সামনে মধুর বাক্য বলে, আড়ালে কাজের ক্ষতি করে–তেমন বন্ধুকে বর্জন করা উচিত ; এরা আসলে এক বিষপূর্ণ পাত্র, যার উপরে থাকে দুধ।

তারপর সেই কাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল–হায় প্রতারক, কী নিষ্ঠুর কাজই তুমি করলে?

মধুর কথায় তোমার সঙ্গে যার আলাপ করানো হল, মিথ্যা সম্ভাষণে তাকে বশীভূত করে; আশা পোষণ করে যে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাকে কি এইভাবে বঞ্চনা করা সঙ্গত?

উপকারী, শুদ্ধমতি ও বিশ্বাসপ্রবণ ব্যক্তিদের প্রতি যে পাপানুষ্ঠান করে, হে ভগবতি বসুধে! কেন তুমি তাকে বহন করছ?

দুর্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়। তপ্ত অবস্থায় অঙ্গার হাত দগ্ধ করে, শীতল হলে হাতকে করে নোংরা। অথবা–

এই-ই হল দুর্জনের কার্যধারা। দুষ্টের এই কার্যরীতি অনুকরণ করে মশকে। সে প্রথমে পায়ে পড়ে, তারপর দংশন করে পিঠে, তারপর কর্ণে এক মধুর ও অস্পষ্ট গুঞ্জন করতে থাকে; শেষে একটা ছিদ্র স্থির করে নিয়ে নির্ভয়ে সেই পথে প্রবেশ করে।

দুর্জন প্রিয়ভাষী হলেও তাকে বিশ্বাস করা অনুচিত; তার জিহ্বায় মধু কিন্তু হৃদয়ে তীব্র বিষ।

তারপর প্রভাতে কাক দেখতে পেল লগুড় হাতে ক্ষেত্রপতি সেই দিকেই আসছে। তাকে দেখে কাক বলল–সখে মৃগ, পা স্থির রেখে, বাতাসে উদর পূর্ণ করে, মৃতের মত পড়ে থাকো, আমি যখন শব্দ করব তখন উঠে কোন বিলম্ব না করে পালিয়ে যাবে। এর পর ক্ষেত্রপতি এলো–মৃগকে সেই অবস্থায় দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তার নয়ন। সে বলে উঠল–আঃ, নিজে থেকে মরে বসে আছ?–এই বলে সে হরিণকে বন্ধন থেকে মোচন করে জাল গুটিয়ে ফেলতে উদ্যত হল। তখন কাকের শব্দ শুনে হরিণ তৎক্ষণাৎ উঠে পালিয়ে গেল। তাকে লক্ষ্য করে ক্ষেত্রপতি যে লগুড় নিক্ষেপ করল তাতে নিহত হল শৃগাল। (শাস্ত্রে) বলা হয়েছে–সৎ কি অসৎ কাজ যখন শেষ সীমায় পৌঁছয় তখন তিন বছরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে এমন কি তিন দিনেই মানুষ তার ফলভোগ করে।

তাই আমি (হিরণ্যক) বলছিলাম–ভক্ষ্য এবং ভক্ষকের মধ্যে প্রীতি বিপত্তিরই কারণ হয়ে ওঠে। কাক (লঘুপতনক) আবার বলল–আপনাকে ভক্ষণ করলেও

আমার প্রচুর খাদ্য হবে না। আর আপনি বেঁচে থাকলে, হে নিষ্পাপ, আমি চিত্রগ্রীবের মতোই বেঁচে থাকব। তাছাড়া—

পুণ্যকর্মকারী ক্ষুদ্র প্রাণীদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস দেখা যায়। যারা সৎ, তারা স্বভাবতই সৎ—সেই স্বভাব থেকে তারা ভ্রষ্ট হন না।

আর একটি কথা—

সাধু ব্যক্তি প্রকুপিত হলেও তার মনের কোন বিকৃতি ঘটে না, তৃণজাত অগ্নিতে সাগরের জল তপ্ত করা সম্ভব নয়।

হিরণ্যক বলল—তুমি চপলস্বভাব; চপলের সঙ্গে প্রীতিস্থাপন করা অনুচিত। লোকে বলে—মার্জার, মহিষ, মেষ, কাক এবং দুষ্টব্যক্তি—এরা বিশ্বাসের সূত্র ধরেই আমাদের প্রভাবিত করে। এদের বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া—

তুমি আমাদের শত্রুপক্ষীয়। লোকে বলে—

সুদৃঢ় সন্ধির মাধ্যমেও শত্রুর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা উচিত নয়। জল সুতপ্ত হলেও অগ্নিকে নির্বাপিত করে।

বিদ্যাগুণে অলংকৃত হলেও দুর্জনকে পরিহার করা কর্তব্য। মণিতে অলংকৃত হলেও সাপ কি ভয়ংকর নয়।

যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হতে পারে না, যা সম্ভব তা সম্ভবই বটে। শকট কখনও জলে চলতে পারে না, নৌকাও স্থলে যেতে পারে না। তাছাড়া—

অধিক অর্থবলের সামর্থ্যে নির্ভর করে শত্রুকে বা প্রেমহীন ভাষাকে যে বিশ্বাস করে, বুঝতে হবে তার অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে।

লঘুপতনক বলল—সব কথাই শুনলাম। তবু আমার এই সংকল্প যে আমি তোমার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হব। তা যদি না হয় তবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। কারণ—দুর্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব মাটির পাত্রের মতো সহজেই ভেঙে যায়, তাকে আবার জোড়া দেওয়াও কঠিন; সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বর্ণপাত্রের মতো, ভাঙাও কঠিন, ভাঙলেও জোড়া দেওয়া সহজ।

আর একটি কথা, দ্রবত্বগুণের জন্যেই বিভিন্ন ধাতুর মিলন ঘটে, অন্য নিমিত্ত হেতু মিলন ঘটে পশুপাখিদের মধ্যে; ভয়ে কিংবা কোন লাভের আশায় মিলন হয় মূর্খদের মধ্যে আর দর্শনেই মিলন হয় সজ্জনদের।

বন্ধুরা হলেন নারিকেল ফলের মতো (বাহিরে কঠিন, ভিতরে মধুর); অন্যেরা বদরীফলের মতো—বাহিরেই সুন্দর।

স্নেহবন্ধনের সমাপ্তি ঘটলেও সজ্জনের গুণে (ব্যবহার ইত্যাদিতে) কোন বিকৃতি হয় না। মৃণালদণ্ড ভেঙে গেলেও তন্তুগুলো লেগে থাকে। তাছাড়া—

সংকল্পের শুচিতা, উদারতা, শৌর্য, সুখ-দুঃখে সমভাব, বিনয়, অনুরাগ ও সত্যবাদিতা—এই সব যথার্থ বন্ধুর গুণ।

এই সব গুণে বিভূষিত তোমাকে ছাড়া আর কাকে আমি বন্ধুরূপে পাব?

তার এই সব কথা শুনে হিরণ্যক বাইরে বেরিয়ে এসে বলল—তোমার এই বচন-সুধায় আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। লোকে বলে—সুশীতল জলে স্নান, মুক্তাহার, প্রতি অঙ্গে চন্দনের অনুলেপন গ্রীষ্মতপ্ত মানুষকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারে না—যেমন দিতে পারে গুণী ব্যক্তিকে সজ্জনের প্রীতিপূর্ণ ভাষণ যদি তা স্নেহে উচ্চারিত, সুচিন্তাযুক্ত

এবং আকর্ষণের মন্ত্রে স্নিগ্ধ হয়। তাছাড়া–

গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা, ভিক্ষাবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, অবিশ্বস্ততা এবং দ্যূতক্রীড়া–এইগুলি মিত্রের পক্ষে দূষণীয়।

এখানে যে দোষগুলির উল্লেখ করা হল–তাদের মধ্যে একটিও তোমার নেই। কারণ–

নৈপুণ্য ও সত্যবাদিতা বার্তালাপের মধ্যেই বোঝা যায়, কর্মশক্তি ও বিবেচনা ধরা পড়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়।

তাছাড়া যাদের মন স্বচ্ছ তাদের মৈত্রীর প্রকৃতিই পৃথক ; যাদের মন শাঠ্যে কলুষিত তাদের কথাবার্তা পৃথক খাতে প্রবাহিত হয়।

দুর্জন মনে এক কথা ভাবে, বলে অন্য কথা, করে অন্য রকম ; যারা সজ্জন তারা মনে এক মুখে এক কাজেও এক।

তাহলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এই বলে হিরণ্যক তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করল। তারপর উত্তম ভোজনে কাককে তৃপ্ত করে নিজের বিবরে প্রবেশ করল। কাকও স্বস্থানে প্রস্থান করল।

সেই দিন থেকে তারা পরস্পর খাদ্য উপহার দিয়ে, কুশল প্রশ্ন করে এবং বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন লঘুপতনক হিরণ্যককে বলল–সখে, এখানে আহার সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যক বলল–কোথায় যাবে বন্ধু ? শাস্ত্রে বলেছে–বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পা বাড়িয়ে দেন–অন্য পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন (অর্থাৎ স্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য পা বাড়ান না) ; পরবর্তী স্থান উত্তমরূপে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী বাসস্থান ত্যাগ করা অনুচিত।

কাক বলল–সুপরীক্ষিত একটি স্থান আছে। হিরণ্যক বলল–কোথায় সেই স্থান ? কাক বলল–দণ্ডকারণ্যে 'কর্পূরগৌর' নামে একটি সরোবর আছে ; সেখানে মন্থর নামে কচ্ছপ বাস করে–সে ধার্মিক আর আমার অনেক দিনের প্রিয় বন্ধু। কারণ পরকে উপদেশ দিতে গিয়ে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন–মানুষের পক্ষে সহজ, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য পালন কেবল মহাত্মাদের পক্ষেই সম্ভব। সে আমাকে উত্তম ভোজনে আপ্যায়িত করবে।

হিরণ্যক বলল–তবে আমি এখানে থেকে কী করব ? কারণ–

যে দেশে মান নেই, খাদ্য-সংস্থান নেই, বন্ধু নেই, বিদ্যার্জনের কোন সম্ভাবনা নেই সে দেশ বর্জন করা উচিত। তাছাড়া–

উপার্জনের উপায়, (শাসকের) ভয়, লজ্জা, দাক্ষিণ্য ও দান–এই পাঁচটি যেখানে নেই সেই দেশে বাস করা অসঙ্গত।

হে বন্ধু, ঋণদাতা, চিকিৎসক, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং সজলা নদী–এই চারটি যেখানে নেই সেখানে বাস করা অনুচিত।

তাহলে আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও। তখন কাক তার বন্ধুর সঙ্গে বিচিত্র বার্তালাপ করতে করতে সেই সরোবরের নিকটে গেল। তারপর মন্থর দূর থেকে দেখতে পেয়ে লঘুপতনকের উপযুক্ত অতিথি সৎকার করে মূষিককেও আপ্যায়িত করল। কারণ–বালক, যুবা, বা বৃদ্ধ যে-ই গৃহে আসুক তার সংবর্ধনা করা কর্তব্য।

অতিথি সকল স্থানেই গুরুতুল্য।

কাক বলল—সখে মন্থর, বিশেষরূপে একে সংবর্ধিত কর; কেননা, ইনি পুণ্য-কর্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ইনি দয়ার সাগর, এর নাম হিরণ্যক—ইনি মূষিকরাজ্যের রাজা। সর্পরাজ অনন্ত তার দুই সহস্র জিহ্বাতেও এর গুণবর্ণনা শেষ করতে পারবেন না। এই বলে কাক চিত্রগ্রীবের কাহিনী বর্ণনা করল।

মন্থর পরমাদরে হিরণ্যককে সম্মানিত করে বলল—ভদ্র, এই নির্জন বনে আপনার আগমনের কারণ কী বলুন।

হিরণ্যক বলল—বলছি, শোন।

কথা ॥ চার

চম্পক নামে এক নগরীতে সন্ন্যাসীদের এক মঠ ছিল; সেখানে চূড়াকর্ণ নামে এক সন্ন্যাসী থাকতেন। ভোজনের পরে তিনি অবশিষ্ট ভিক্ষান্ন ভিক্ষাপাত্রে কাঠের কীলকে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমোতেন। আমি লাফিয়ে উঠে প্রতিদিন সেই অন্ন খেতাম।

তারপর তার প্রিয় বন্ধু বীণাকর্ণ নামে এক সন্ন্যাসী এলেন। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে জীর্ণ এক বাঁশের লাঠি দিয়ে ভূমিতে আঘাত করতে লাগলেন। বীণাকর্ণ বললেন আমার কথায় উদাসীন হয়ে আপনি অন্য ব্যাপারে মন দিলেন কেন? চূড়াকর্ণ বললেন—বন্ধু, আমি উদাসীন নই; কিন্তু দেখ, ঐ মূষিক আমার অপকারী, পাত্রে যে ভিক্ষান্ন রাখা হয়েছে তাই প্রতিদিন লাফিয়ে এসে খেয়ে যাচ্ছে।

বীণাকর্ণ কাঠের কীলকটি দেখে বললেন—মূষিকের কত অল্প শক্তি—সে কী করে এত উঁচুতে লাফিয়ে উঠেছে। নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে। শাস্ত্রে আছে—

যুবতী নারী হঠাৎ তার বৃদ্ধ স্বামীকে কেশে আকর্ষণ করে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল—তারপর তাকে চুম্বন করল—এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে।

চূড়াকর্ণ বললেন—সে আবার কী। বীণাকর্ণ বলতে লাগলেন—

কথা ॥ পাঁচ

গৌড়দেশে কৌশাম্বী নামে এক নগরী ছিল। সেখানে অত্যন্ত ধনী এক বণিক বাস করতেন—নাম চন্দন দাস। পরিণত বয়স হলেও ধনগর্বে এবং কামার্ততাবশত তিনি লীলাবতী নামে এক বণিককন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি যৌবনবতী হলেন, দেখে মনে হত যেন কামদেবতার বিজয়বৈজয়ন্তী। তখন সেই বৃদ্ধ পতি আর তাকে তৃপ্তি দিতে পারলেন না।

কারণ—হিমার্ত ব্যক্তি যেমন চন্দ্রকিরণে তৃপ্তি পায় না, ঘর্মাক্ত ব্যক্তি যেমন সূর্য কিরণে আনন্দ লাভ করে না তেমনি যে স্বামীর ইন্দ্রিয় জরাজীর্ণ তাকে নিয়েও স্ত্রীলোকের মন খুশি হয় না। তাছাড়া—

পলিতকেশ বৃদ্ধদের কামপরায়ণতার কী অর্থ যখন স্ত্রীলোকেরা অন্যাসক্ত হয়ে তাদের ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করে।

সেই বৃদ্ধ পতি কিন্তু তার স্ত্রীর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। কারণ—ধনের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের আশা প্রত্যেক মানুষের নিকটে প্রিয়—কিন্তু বৃদ্ধের নিকটে তরুণী ভার্যা তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।

জরাগ্রস্ত ব্যক্তি বিষয় ভোগ করতে পারে না—বিষয় ত্যাগও করতে পারে না। দন্তহীন কুকুর যেমন জিহ্বা দ্বারা অস্থি লেহন করে—(ফেলেও দিতে পারে না)।

এদিকে সেই লীলাবতী যৌবনের দর্পে বংশের মর্যাদা লঙ্ঘন করে কোন এক বণিকপুত্রের প্রেমাসক্ত হল। কারণ—স্বাতন্ত্র্য পিতৃগৃহে বাস (বিবাহের পরে), উৎসবের সমাবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা, পুরুষের সামীপ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন, দলের সংসর্গ, বিদেশে বাস, দুশ্চরিত্রা নারীদের সংসর্গ, নিজের সঙ্গত বৃত্তির অবিরাম ক্ষতি, স্বামীর বার্ধক্য, তার ঈর্ষা অথবা বিদেশে তার অনুপস্থিতি—এইগুলোই স্ত্রীলোকের চরিত্রহানির কারণ। তাছাড়া—

মদ্যপান, অসৎসংসর্গ, পতিবিরহ, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো, অন্যের গৃহে বাস, নিদ্রা—এই ছয়টি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ ডেকে আনে।

*　　*　　*　　*

নারী নিত্যচপলা, দেবগণও এ কথা জানেন ; তারাই সুখী যাদের নারী সুরক্ষিত।

নারীদের অপ্রিয় কেউ নেই, তাদের প্রেমের পাত্রও কেউ নেই। গরু যেমন নিত্যনূতন তৃণভোজনে উৎসুক হয়—তারাও নূতন নূতন পুরুষ কামনা করে।

নারী যেন ঘৃতের পাত্র, আর পুরুষ যেন তপ্ত অঙ্গার। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত এবং অগ্নি একটি স্থানে রাখা সঙ্গত নয়। তাছাড়া—

লজ্জা নয়, বিনয় নয়, দাক্ষিণ্য নয়, ভীরুতা নয়—কামনার অভাবই স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষার মূলে।

পিতা রক্ষা করেন কৌমারে যৌবনে রক্ষা করেন স্বামী, বার্ধক্যে রক্ষা করে পুত্র—স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নয়।

একদিন লীলাবতী রত্নাবলীর কিরণে শয্যায় সুখে উপবেশন করে বণিকপুত্রের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে মত্ত ছিল এমন সময় সেখানে অভাবিতরূপে উপস্থিত হলেন তার স্বামী। স্বামীকে আসতে দেখে সে সহসা উঠে দাঁড়াল, তারপর কেশে আকর্ষণ করে তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে অবদ্ধ করল—তারপর তাকে চুম্বন করল। এই অবসরে সেই উপপতিও পলায়ন করল। এ কথা বলা হয়েছে—শুক্রাচার্য যে বিদ্যা জানেন—সেই সমস্তই একত্র নারীদের শ্রীবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

কুট্টনী কাছেই ছিল। এই আলিঙ্গন দেখে সে ভাবল—এই নারী অকস্মাৎ তার পতিকে আলিঙ্গন করেছে (এর কী কারণ ?)। সেই কারণ যখন সে জানতে পারল তখন লীলাবতীকে গোপনে কিছু দণ্ড দিতে হয়েছিল।

এই জন্যেই আমি বলছিলাম—যুবতী নারী হঠাৎ তার বৃদ্ধ পতিকে চুম্বন করল—এর একটা কারণ থাকবেই। এক্ষেত্রে মূষিকের শক্তি পুষ্ট হচ্ছে—এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সেই পরিব্রাজক বলল—এর কারণ, এখানে প্রচুর ধন রয়েছে। কারণ—এই পৃথিবীতে ধনবান লোক সর্বত্র সকল সময়েই বলবান। রাজাদেরও প্রভুত্বের মূলে রয়েছে ধন।

তারপর সে খন্তা নিয়ে গর্ত খনন করল এবং আমার চিরসঞ্চিত ধন নিয়ে গেল।

তারপর থেকে আমি শক্তিহীন হয়ে পড়লাম ; উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে আমি নিজের খাদ্যসংগ্রহেও অক্ষম হলাম। একদিন আমি ভয়ে ধীরে ধীরে খাচ্ছি এমন সময়ে আমাকে চূড়াকর্ণ দেখতে পেল। সে বলল—

এ সংসারে মানুষ ধনেই বলবান হয়। ধন থাকলেই লোকে তাকে পণ্ডিত মনে করে। দেখ, এই দুষ্ট মূষিক স্বজাতীয় অন্যান্যদের সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও যদি অর্থহীন হয় তবে তার সমস্ত কাজই গ্রীষ্মকালের ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। তাছাড়া—

যার অর্থ আছে তারই বন্ধু থাকে, যার অর্থ আছে তারই আত্মীয় থাকে। যার অর্থ আছে—সে-ই সংসারে মানুষ বলে গণ্য হয়, যার অর্থ আছে তাকেই সকলে পণ্ডিত মনে করে।

আর একটি কথা, যে পুত্রহীন তার গৃহ শূন্য—যার কোন ভালো বন্ধু নেই তারও গৃহ শূন্য ; যে মূর্খ তার সমস্ত দিক শূন্য আর যে দরিদ্র তার সমস্তই শূন্য।

সেই ইন্দ্রিয় আগের মতোই অক্ষত, আগের মতোই নাম, আগের মতোই বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ, কথাও আগের মতোই—সেই পুরুষই যদি অর্থের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হয় তবে তাকে মুহূর্তের মধ্যেই অন্য মানুষ বলে মনে হতে থাকে। —এ এক আশ্চর্য ব্যাপার !

এই এক কথা শুনে আমি ভেবে দেখলাম—এখন আমার আর এখানে থাকা ঠিক নয়, আর এই ব্যাপারটি অন্যের নিকটে ব্যক্ত করা—তাও ঠিক নয়। কারণ—

অর্থনাশ, মনের দুঃখ, গৃহের কোনরকম দুষ্ক্রিয়া, বঞ্চনা বা অপমানের কথা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও প্রকাশ করেন না। তাছাড়া—

আয়ুষ্কাল, অর্থের পরিমাণ, পারিবারিক গোপন তথ্য, মন্ত্র, স্ত্রীসঙ্গম, ঔষধ, তপস্যা, দান এবং নিজের অপমান—এই নয়টি বিষয় সযত্নে গোপন রাখতে হয়।

লোকে বলে, ভাগ্য যখন অত্যন্ত প্রতিকূল, পরিশ্রম ও পৌরুষ যখন ব্যর্থ তখন দরিদ্র মনস্বী ব্যক্তি অরণ্য ছাড়া আর কোথায় সুখ খুঁজে পাবেন ?

দেখ, মনস্বী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু নীচতা আশ্রয় করেন না। অগ্নি নিভে যায় কিন্তু শীতল হয় না।

আরও দেখ, পুষ্পস্তবকের মতোই মনস্বী ব্যক্তির দুইটি কর্মধারা—হয় মস্তকে অবস্থান নয় অরণ্যে ঝরে-পড়া।

এখানে ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ হবে অত্যন্ত নিন্দনীয়—কারণ অর্থহীন ব্যক্তি বরং নিজের দেহদান করে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেন, তবু কদাচারভ্রষ্ট হীন ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করেন না।

দারিদ্র্য থেকেই মানুষের লজ্জা, লজ্জায় অভিভূত হয়ে সে মানসিক শক্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়, মানসিক শক্তি না থাকলে সর্বত্র পরাজয়, পরাজয় থেকে ক্ষোভ। ক্ষোভ থেকে শোক, শোকগ্রস্ত মানুষকে বুদ্ধিও ত্যাগ করে, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সর্বনাশের পথে অগ্রসর হয়। হায়, ধনহীনতা সকল আপদের মূল।

আরও একটি কথা, মৌন ভালো ; কিন্তু মিথ্যাভাষণ ভালো নয়, পুরুষের পক্ষে ক্লৈব্য ভালো কিন্তু পরদারগমন অন্যায় ; মৃত্যু ভালো কিন্তু দুষ্টবাক্যে অভিরুচি নয়, ভিক্ষান্ন ভক্ষণও বাঞ্ছনীয় কিন্তু পরধনের আস্বাদন-সুখ পরিত্যাজ্য।

দুষ্ট ষাঁড় থাকা অপেক্ষা শূন্য গোশালাও ভালো, অবিনীত কুলবধূ অপেক্ষা গণিকা স্ত্রীও ভালো ; অবিবেকী রাজার শাসনে থাকা অপেক্ষা অরণ্যবাসও ভালো ; হীন ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও ভালো।

দাসত্ববৃত্তি যেমন সকল মানসম্পদ নষ্ট করে, জ্যোৎস্না যেমন অন্ধকার হরণ করে, জরা যেমন সৌন্দর্যকে তিরোহিত করে, বিষ্ণু ও শিবের কথা যেমন পাপনাশ করে, ভিক্ষাবৃত্তি তেমন হরণ করে শত শত গুণ।

এইভাবে চিন্তা করে (আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম) আমি কি তবে পরান্নে জীবিকা নির্বাহ করব ? কী কষ্ট—এও তো মৃত্যুর দ্বিতীয় দ্বার !

পল্লবগ্রাহী বিদ্যা, অর্থের বিনিময়ে সঙ্গসুখ, পরের অধীন ভোজন—এই তিনটি পুরুষের পক্ষে বিড়ম্বনা।

রোগী, দীর্ঘপ্রবাসী, পরান্নভোজী এবং পরগৃহশায়ী—এইরূপ ব্যক্তি যে জীবন ধারণ করে তাই তার কাছে মরণতুল্য. এমন ব্যক্তির যে মরণ তা-ই তার বিশ্রাম।

এইরূপ আলোচনা করেও আমি লোভের বশবর্তী হয়ে আর অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হলাম। শাস্ত্রে বলেছে—বুদ্ধি বিচলিত হয় লোভে, লোভ থেকেই তৃষ্ণার জন্ম, তৃষ্ণার্ত দুঃখভোগ করে ইহলোকে এবং পরলোকে।

যখন আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন বীণাকর্ণ আমাকে জীর্ণ বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। আমি ভাবলাম—যে লুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট সে নিজের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ—যার মন সন্তুষ্ট তারই তো সমস্ত সম্পদ। পাদুকায় যার চরণ আবৃত সমস্ত পৃথিবীই তো তার কাছে চর্মে আবৃত।

আরও একটি কথা।

শান্ত চিত্ত যে সব মানুষ সন্তোষের অমৃতপানে তৃপ্ত তারা যে সুখ উপভোগ করেন সেই সুখ তাদের কোথায় যারা ধনলুব্ধ হয়ে এখানে ওখানে ছুটে বেড়ান ? তাছাড়া—

তিনিই সব কিছু পড়েছেন, শুনেছেন এবং অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করেছেন যিনি সমস্ত কামনা বর্জন করে সন্তোষের আশ্রয় নিয়েছেন।

দুর্লভ সে মানুষের জীবন সত্যিই ধন্য যে জীবনে ধনীর দুয়ারে ধর্না দিতে হয়নি, যে জীবনে বিরহ-ব্যথা সহ্য করতে হয় নি আর যে-জীবনে অসহায়ের উক্তি নেই।

তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত ব্যক্তির পক্ষে একশত যোজনও কোন দূরত্ব নয়। যিনি সন্তুষ্ট তার হস্তে প্রাপ্ত বস্তুর প্রতিও কোন আদর থাকে না।

সুতরাং এই অবস্থায় কী করণীয় তার আলোচনা করা ভালো। ধর্ম কী ? সর্বভূতে দয়া ; সুখ কী ? নীরোগিতা। স্নেহ কী ? সদ্ভাব। পাণ্ডিত্য কী ? নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

কারণ, বিপদ উপস্থিত হলে স্থির সিদ্ধান্ত পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। যারা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারেন না তাদের বিপদ পদে পদে। তাছাড়া—

বংশের রক্ষায় একজনকে ত্যাগ করা উচিত, গ্রামের স্বার্থে বংশত্যাগ প্রয়োজন ; নগরের রক্ষায় গ্রামকে বর্জন করাই উচিত ; পৃথিবী ত্যাগ করেও আত্মরক্ষা করা সঙ্গত। আরও দেখ—

সহজে (বিনা আয়াসে)-লব্ধ পানীয় জল আর যে অন্নের সঙ্গে ভয় জড়িত—এই দুইটির মধ্যে বিবেচনা করলে আমার মনে হয় যেখানে স্বস্তি তাই ভালো।

এই কথা ভেবে আমি নির্জন বনে চলে এলাম। কারণ—

যেখানে ব্যাঘ্র এবং বৃহৎ হস্তী বাস করে, যেখানে বৃক্ষ বাসগৃহ, পক্ক ফল এবং জলই খাদ্য—যেখানে তৃণরাশি শয্যা এবং বল্কল পরিধেয়—সেই বনও ভালো তবু আত্মীয়দের মধ্যে দরিদ্র জীবন বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার পুণ্যফলে এই বন্ধুর (লঘুপতনক) স্নেহসম্পর্কের দ্বারা আমি অনুগৃহীত হয়েছি ; সেই পুণ্যক্রমেই আজ আপনার (মন্থর) আশ্রয় পেলাম—এ তো আমার পক্ষে স্বর্গ। কারণ—

সাংসারিক অস্তিত্ব একটি বিষবৃক্ষের তুল্য, এই বৃক্ষের দুটি মাত্র ফল মধুর—কাব্যামৃতরসের আস্বাদন আর সজ্জনের সঙ্গে মৈত্রী।

মন্থর বলল—অর্থ পদধূলির মতোই ক্ষণস্থায়ী, যৌবন পার্বত্য নদীর গতিতে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে যায়, আয়ু অস্থির জলবিন্দুর মতো চঞ্চল। (এই যখন অবস্থা) তখন যে বিচারবুদ্ধিহীন হয়ে স্বর্গদ্বারের অর্গল মোচনে সক্ষম ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করে না, সে জরাগ্রস্ত হয়ে অনুতাপে ক্লিষ্ট হয়ে দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকে।

আপনি অতিসঞ্চয় করেছিলেন, এই কুফল তারই জন্যে। শুনুন—

সঞ্চিত অর্থের দানই সঞ্চয়—সরোবরে জল রক্ষার জন্যেই যেমন বহিঃপ্রণালীর প্রয়োজন হয়। কারণ—

যে কৃপণ মাটিতে গর্ত খনন করে নীচে অর্থ সঞ্চয় করে তাকেও মাটির নীচে যাবার জন্যে (অর্থাৎ নীচের সদৃশ হবার জন্যে) আগেই পথ নির্মাণ করতে হয়।

তাছাড়া যে নিজেকে সুখ থেকে বঞ্চিত করে ধন সংগ্রহ করতে চায়, সে অন্যের জন্যে ভারবাহী ব্যক্তির মতো দুঃখভাগী। আর একটি কথা—

দান নেই, উপভোগ নেই এমন ধনেও যদি কেউ ধনী বলে সম্মানিত হয় তবে সেই ধনেই আমরা কেন নিজেদের ধনী বলে মনে করব না ? তাছাড়া—

উপভোগ করা হয় না বলেই কৃপণের ধন অন্য সকলের সাধারণ সম্পদ ; ধন হারিয়ে যাবার পর তার যে দুঃখ হয় শুধু তাতেই বোঝা যায়—এ ধন তার।

মধুর বাক্য, সম্মিলিত দান, অহঙ্কারহীন বিদ্যা, ক্ষমাযুক্ত বীরত্ব এবং দানে ব্যয়িত অর্থ—এই চারিটি সংসারে দুর্লভ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

নিত্য সঞ্চয় করা উচিত, কিন্তু অতিসঞ্চয় করা অসঙ্গত ; সঞ্চয়শীল সেই শৃগাল তো অতি সঞ্চয় করতে গিয়েই ধনুকে আহত হয়ে প্রাণ দিল।

তারা দুজনে (কাক ও মূষিকরাজ হিরণ্যক) বলে উঠল—সে আবার কী ?

মন্থর বলতে শুরু করল—

কথা ॥ ছয়

কল্যাণনগরে এক ব্যাধ বাস করত—তার নাম ভৈরব। এক দিন সে পশুর সন্ধানে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করল। সেখানে সে এক মৃগকে বধ করে তাকে নিয়ে যেতে যেতে এক ভীষণাকৃতি শূকরকে দেখতে পেল। তখন সে হরিণটিকে মাটিতে রেখে শূকরটিকে শরবিদ্ধ করল। শূকরও ভীষণ গর্জন করে ছুটে এসে ব্যাধকে আঘাত করল আর ব্যাধও ছিন্ন বৃক্ষের মতো মাটিতে পড়ে গেল। কারণ—

জল, অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, ক্ষুধা, রোগ, পর্বত থেকে পতন—এর যে কোন একটি

নিমিত্তের সঙ্গে যোগ ঘটলেই প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তারপর তাদের (শূকর ও ব্যাধের) পায়ের আস্ফালনে একটি সর্পের মৃত্যু হল। তারপর শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে দীর্ঘরাব নামে এক শৃগাল সেইখানে এসে দেখতে পেল—হরিণ, ব্যাধ, সর্প ও শূকর মরে পড়ে আছে। সে ভাবল আজ আমার এক বিরাট ভোজ।—এ কথা ঠিক যে—

অভাবিত দুঃখ যেমন প্রাণীদের কাছে উপস্থিত হয়, মনে হয় সুখও সেই ভাবেই আসে। আসলে দৈবই এখানে বলবান।

যা হোক, এদের মাংসে তিন মাস আমার আরামে চলে যাবে।—

মানুষটার মাংসে আমার এক মাস যাবে ; হরিণ আর শূকরের মাংসে যাবে দু মাস, সাপের মাংসে একদিন ; আজ ধনুকের ছিলা খেয়েই থাকি।

তাহলে, প্রথম ক্ষুধায় এই ধনুকে লগ্ন, স্বাদহীন, স্নায়ুতে তৈরি ছিলা খাই। এই বলে সে তাই করল। তখন হঠাৎ স্নায়ুর ছিলা ছিঁড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে এসে সেই ধনু বিদ্ধ হল শৃগালের বুকে।

শৃগালের মৃত্যু হল। তাই বলছিলাম—নিত্যসঞ্চয় ভালো কিন্তু অতি সঞ্চয় ভালো নয়। কারণ—

ধনী যে দান করে অথবা ভোগ করে তা-ই তার ধন ; তার মৃত্যুর পরে অন্যেরা এসে তার ভার্যা ও ধন নিয়ে খেলা করে।

সেই তো আপনার ধন যা আপনি যোগ্য ব্যক্তিকে দান করেন অথবা দিনে দিনে ভোগ করেন—অবশিষ্ট যা কিছু তা আপনি অন্যের জন্যে সঞ্চয় করেন।

যা হোক ; অতীত বিষয়ের আলোচনায় লাভ নেই। কারণ—

পরিণতবুদ্ধি পণ্ডিতগণ অপ্রাপ্যকে লাভ করতে চান না—যা নষ্ট তা নিয়ে তারা শোক করেন না, বিপদের মধ্যেও তারা মুহ্যমান হন না।

সুতরাং সর্বদাই আপনার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রাখুন। শাস্ত্র পাঠ করেও লোকে মূর্খ থাকে, যে জ্ঞানকে কাজে প্রয়োগ করতে পারে সে-ই জ্ঞানী। ঔষধ সুচিন্তিত হলেও নাম উচ্চারণমাত্রে রুগ্নকে নীরোগ করে না। তাছাড়া—

যে নিজে পরিশ্রমে বিমুখ কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা কিছু করতে পারে না। অন্ধের করতলে প্রদীপ রাখলেও সেই প্রদীপ কোন পদার্থই আলোকিত করে না।

সখে, এই পরিবর্তিত দশায় আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে। এ কাজটিও অতি কঠিন বলে মনে করবেন না। কারণ—রাজা, কুলবধূ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও মানুষ, স্তন, দাঁত, নখ—এরা স্থানভ্রষ্ট হলে আর শোভা পায় না।

এই কথা মনে রেখে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও নিজের স্থান ত্যাগ করবেন না। এটি কাপুরুষের উক্তি। কেননা—

সিংহ, সৎপুরুষ, হস্তী—স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যায়, কাক, কাপুরুষ, হরিণ—এরা নিজের স্থানেই প্রাণত্যাগ করে।

যিনি মনস্বী বীর তার কাছে কোন্‌টি স্বদেশ কোন্‌টিই বা বিদেশ ? তিনি যে দেশে যান সেই দেশই বাহুবলে জয় করেন ; সিংহ যে বনে প্রবেশ করে—তার অস্ত্র থাকে দন্ত, নখ এবং পুচ্ছ—এরই বলে সে সেখানে হস্তী নিধন করে তার রক্তে তৃষ্ণা দূর করে।

কূপ বা দীঘিকে যেমন মণ্ডূক আশ্রয় করে, পূর্ণ সরোবরকে যেমন পাখিরা আশ্রয়

করে, সমস্ত সম্পদ তেমনি যেন অসহায়ভাবেই উদ্যোগী মানুষের নিকটে আত্মসমর্পণ করে। আর একটি কথা–

সুখ এলে তাকে যেমন অভ্যর্থনা করতে হবে–দুঃখকেও সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে। সুখ ও দুঃখ চক্রের মতো পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আরও একটি কথা–

উৎসাহী, কর্মনিপুণ, কর্মবিধি যিনি জানেন, কোনরূপ ব্যসনে অনাসক্ত, যিনি বীর, কৃতজ্ঞ, বন্ধুত্বে যিনি অচল–এমন পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয়ের জন্যে বরণ করেন।

বিশেষত–বীরপুরুষ অর্থহীন হয়েও বহুমানযুক্ত উন্নত পদের অধিকারী হয়ে থাকে, কৃপণ অর্থবান হলেও হয় উপেক্ষার পাত্র। কুকুরের কণ্ঠে স্বর্ণমালা পরালেও কি সে সিংহের মহিমা লাভ করতে পারে? এই মহিমা তো স্বাভাবিক সম্পদ–কতকগুলি সদ্‌গুণের বিনিময়েই তা লাভ করা সম্ভব।

যখন তুমি ধনের অধিকারী তখন কেন গর্বিত হবে? আর যখন ধন থাকবে না তখন কেন বিষণ্ণ হবে? মানুষের ভাগ্যের উত্থান ও পতন হস্তোৎক্ষিপ্ত বন্দুকের মতো।

মেঘের ছায়া, দুষ্টের প্রীতি, নূতন শস্য, নারী, যৌবন ও ধন–কিছুকালের জন্যেই উপভোগ্য।

জীবিকার জন্যে অত্যন্ত অধিক চেষ্টার প্রয়োজন নেই–কারণ তা বিধাতাই সৃষ্টি করে রেখেছেন। সন্তান গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরই মাতৃস্তন দুগ্ধধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সখে, আরও দেখ–

যিনি হাঁসকে শুক্লবর্ণে, শুককে সবুজে সাজিয়েছেন–যিনি ময়ূরকে বিচিত্রিত করেছেন, তিনিই তোমার জীবিকার ব্যবস্থা করবেন।

আরও শোন ভালোর রহস্যকথা–

অর্থ অর্জনকালে দুঃখ দেয়, বিপদে (অভাবের জন্যেই) মনস্তাপ সৃষ্টি করে, সম্পদকালে মোহের সৃষ্টি করে–তবে অর্থকে সুখদাতা বলব কেন?

ধর্মের জন্যে যিনি অর্থসংগ্রহে ইচ্ছুক তার পক্ষে সেই ইচ্ছা দমন করাই ভালো। পঙ্কিল হলে তাতে প্রক্ষালনের চেয়ে দূরে থেকে সেই পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত।

কারণ, আকাশে যেমন পাখিরা আমিষ (খাদ্য) ভক্ষণ করে, পশুরা মর্ত্যে এবং কুমীর জলে ভক্ষণ করে তেমনি ধনী সর্বত্র তার খাদ্য লাভ করে।

প্রাণীদের যেমন মৃত্যু থেকে ভয়–

তেমনি রাজা, জল, অগ্নি, চোর, স্বজন প্রভৃতি থেকে ধনীদের নিত্য ভয় বর্তমান। তাছাড়া–

এই ক্লেশবহুল জীবনে এর চেয়ে আর বড় দুঃখ কী থাকতে পারে যে ইচ্ছে মতো সম্পদ লাভ করা যায় না–ইচ্ছাও নিবৃত্ত হয় না।

দেখ, আর একটি কথাও শোন–

ধনলাভ অত্যন্ত কঠিন ; লব্ধ ধনকেও অতি কষ্টে রক্ষা করতে হয়, আর নষ্ট হলে তার দুঃখ মৃত্যুর মতো। তাই এ বিষয়ে চিন্তা অনুচিত।

তৃষ্ণা ত্যাগ করলে কে দরিদ্র হয় আর কে-ই বা ধনী হয়ে থাকে? কিন্তু এই তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিলে কপালে দাসত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাছাড়া–

লোকে যা কামনা করে (প্রাপ্তির পরে) সেই কামনা অন্যত্র অগ্রসর হয়। তাকেই যথার্থ পাওয়া বলে যা পেলে কামনা নিবৃত্ত হয়।

এ বিষয়ে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে এখানেই আমার সঙ্গে থাকো। কারণ–

মহাত্মাদের মৈত্রী চিরস্থায়ী, তাঁদের ক্রোধ উদয়মাত্র বিলীন হয়,– দান করে তারা নিঃস্ব হন না।

এই কথা শুনে লঘুপতনক বলল–মন্থর, তুমি ধন্য। তোমার গুণাবলী সব দিক থেকেই প্রশংসার যোগ্য। কারণ–

সৎপুরুষেরাই সৎপুরুষদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ। হস্তী পঙ্কে মগ্ন হলে, হস্তীই সেই পঙ্ক থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে।

যার কাছ থেকে প্রার্থী বা শরণাগতেরা আশায় ব্যর্থ হয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না– শুধু সে-ই পৃথিবীতে প্রশংসার যোগ্য, মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম, সে-ই সৎপুরুষ এবং সে-ই ধন্য।

তারপর তারা (তিন বন্ধু–লঘুপতনক, হিরণ্যক ও মন্থর) ইচ্ছামতো ঘুরে ফিরে প্রসন্নচিত্তে ও সুখে বাস করতে লাগল।

তারপর একদিন এক হরিণ (কোন কারণে) ভয় পেয়ে সেখানে এসে মিলিত হল–তার নাম চিত্রাঙ্গ। তারপর ভয়ের কারণ পিছনে আসছে ভেবে মন্থর জলে প্রবেশ করল, মূষিক গর্তে প্রবেশ করল, কাক উড়ে গিয়ে বৃক্ষচূড়ায় বসল। লঘুপতনক দূরে তাকিয়ে দেখল, ভয়ের হেতু কিছু আসছে না। পরে তার কথা অনুযায়ী সকলেই সেখানে এসে বসল।

মন্থর বলল–ভালো কথা, হে মৃগ, তোমাকে স্বাগত জানাই। এখানে ইচ্ছামতো জলপান ও খাদ্য গ্রহণ কর ; এই বনে তুমি বাস কর, বন তোমাকে প্রভু হিসেবে লাভ করুক। চিত্রাঙ্গ বলল–ব্যাধের ভয়ে আমি এখানে এসে তোমাদের শরণাগত হয়েছি। আমি তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি।

হিরণ্যক বলল–সখে, বন্ধুত্বের কথা যদি বল আমাদের সঙ্গে সেই বন্ধুত্ব তুমি বিনা চেষ্টাতেই লাভ করেছ। কারণ–

বন্ধু চার প্রকার–রক্তের সম্পর্কে, পারিবারিক সূত্রে ; বংশানুক্রমে অথবা বিপদ থেকে রক্ষিত কোন ব্যক্তি।

সুতরাং তুমি এখানে নিজের বাড়ি মনে করে থাক। সে কথা শুনে মৃগ আনন্দে ইচ্ছামতো আহার করে, জল পান করে জলের নিকটবর্তী তরুর ছায়ায় বসল। তখন মন্থর বলল–

সখে, এই নির্জন বনে কে তোমাকে ভয় দেখিয়েছে ? এখানে কি ব্যাধের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে ? মৃগ বলল–

কলিঙ্গ দেশে রুক্মাঙ্গদ নামে রাজা আছেন। দিগ্বিজয়-উপলক্ষ্যে তিনি এসে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছেন। কাল প্রভাতে তিনি কর্পূর সরোবরের কাছে এসে থাকবেন।–এই রকম একটা জনরব ব্যাধদের মুখে শোনা গেছে। সুতরাং এখানেও প্রভাতে থাকাটা ভয়জনক। তাই সময়মতো যা কর্তব্য তা কর।

এ কথা শুনে কচ্ছপ সভয়ে বলল–অন্য একটি জলাশয়ে যাব। কাক এবং মৃগ বলল– তাই হোক। কিন্তু হিরণ্যক হেসে বলল–অন্য জলাশয়ে গেলে মন্থর ভালোই থাকবে। কিন্তু স্থলে যাবার সময় রক্ষার কী উপায় ? কারণ–

জল জলজন্তুদের শ্রেষ্ঠ বল ; দুর্গবাসীদের পক্ষে দুর্গ, পশু এবং অন্য প্রাণীদের পক্ষে নিজেদের ব্যসস্থান আর রাজার শ্রেষ্ঠ শক্তি তার মন্ত্রী।

সখে লঘুপতনক ! এই উপদেশে (মন্থরের) সেই রকম ফলই ফলবে। কারণ—

নিজের চোখে স্ত্রীর স্তনমুকুল পীড়িত হতে দেখে বণিকপুত্র যেমন দুঃখ পেয়েছিলেন—তোমাদেরও তাই হবে।

তারা বলল—সে আবার কী ?

হিরণ্যক বলল—

কথা ॥ সাত

কান্যকুব্জে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বীরপুর নামক নগরের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন এক রাজপুত্রকে—তার নাম তুঙ্গবল।

এই রাজপুত্র অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং তরুণ ; তিনি একদিন নিজের নগরে ভ্রমণ করতে করতে এক তরুণ বণিকের যৌবনবতী স্ত্রীকে দেখতে পেলেন—নাম লাবণ্যবতী।

প্রাসাদে ফিরে এসে স্মরাহত চিত্তে তার জন্যে এক দূতী পাঠালেন। কারণ—

মানুষ ততক্ষণই ধর্মপথে চলে, ইন্দ্রিয় শাসন করতে পারে, লজ্জা বোধ করে এবং বিনয় অবলম্বন করে, যতক্ষণ না লীলাবতী সুন্দরীদের আকর্ণবিস্তৃত কৃষ্ণ-পক্ষ্মযুক্ত ভ্রূধনু থেকে নিক্ষিপ্ত, ধৈর্যশালী কটাক্ষশরগুলি তার বক্ষে এসে না পড়ে।

সেই লাবণ্যবতীও তাকে দেখার পর থেকে কামশর-জর্জরিত হৃদয়ে তার কথাই ভাবছিল। লেকে বলে—

অবিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, মায়া, ঈর্ষা, অতিরিক্ত লোভ, সদ্‌গুণাভাব অশুভ চিন্তা—এইগুলি স্ত্রীলোকের স্বভাবজাত দোষ।

দূতীর কথা শুনে লাবণ্যবতী বললেন—আমি পতিব্রতা রমণী, কেমন করে পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হব ? কেননা—

তাকেই ভার্যা বলে যিনি গৃহকর্মে নিপুণা ; তিনিই ভার্যা যিনি সন্তানবতী ; তিনিই ভার্যা যিনি পতিপ্রাণা ; তিনিই ভার্যা একমাত্র পতিই যার ধ্যান।

যার প্রতি স্বামী তুষ্ট নন তিনি ভার্যা নন ; নারীদের স্বামী তুষ্ট হলে সকল দেবতাই তুষ্ট হয়ে থাকেন।

সুতরাং আমার প্রাণেশ্বর আমাকে যা আদেশ করবেন কোন প্রশ্ন না করেই আমি তা পালন করব। দূতী বলল—এই কী সত্য ? লাবণ্যবতী বলল—এই ধ্রুব সত্য। তখন দূতী গিয়ে তুঙ্গবলের কাছে সব কথা নিবেদন করল। তা শুনে তুঙ্গবল বললেন—তার স্বামী তাকে এনে আমার কাছে সমর্পণ করবেন, কেমন করে তা সম্ভব ? দূতী বলল—উপায় বার করুন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৌশলে যা করা যায়, শক্তি প্রকাশে তা সম্ভব নয়। পঙ্কিল পথে যেতে যেতে শৃগাল এক হাতিকে বধ করেছিল।

রাজপুত্র প্রশ্ন করলেন— তার মানে —

দূতী বলতে শুরু করল—

ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামক এক হাতি থাকত। তাকে দেখে শৃগালেরা ভাবল–যদি কোন রকমে এই হাতির মরণ হয়–তাহলে এর দেহে আমাদের চার মাসের ইচ্ছা-মতো ভোজন চলবে। সেখানে এক বৃদ্ধ শৃগাল প্রতিজ্ঞা করল–আমি বুদ্ধিপ্রভাবে এর মৃত্যু ঘটাব।

তারপর সেই ধূর্ত শৃগাল কর্পূরতিলকের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল–অনুগ্রহ করে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

হাতি বলল–কে তুমি, কোথা থেকে এসেছ ?

সে বলল–আমি এক (সামান্য) শৃগাল। বনবাসী সমস্ত পশু মিলিত হয়ে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। যেহেতু রাজা বিনা থাকা সঙ্গত নয়, সেইজন্যে আপনিই এই বনরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন, প্রভুত্বের সমস্ত গুণেই আপনি বিভূষিত। কেননা–

যিনি বংশ, আভিজাত্য এবং আচারে অত্যন্ত শুদ্ধ–যিনি বীর, ধার্মিক ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ–তিনি পৃথিবীতে রাজপদের যোগ্য। তাছাড়া–

প্রথমে রাজা চাই, তারপর ভার্যা, তারপর ধন।

এই পৃথিবীতে যদি রাজা না থাকে তবে কোথায় ভার্যা আর কোথায় ধন ?

আর একটি কথা–

মেঘের মতোই রাজা প্রাণীদের আশ্রয়। বৃষ্টির অভাবে জীবন ধারণ সম্ভব, কিন্তু রাজার অভাবে তা সম্ভব নয়। আরও দেখুন–

এই পরস্পর-নির্ভর সংসারে শাস্তির ভয়েই মানুষ কর্তব্যের সীমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখে ; সৎ স্বভাবের মানুষ দুর্লভ ; শাস্তির ভয়েই সদ্‌বংশজাতা নারী তার স্বামী কৃশ, বিকল, রুগ্ন বা নির্ধন হলেও তার প্রতিই বিশ্বস্তা থাকে।

এখন শুভলগ্ন যাতে উত্তীর্ণ না হয় সেভাবে আমার সঙ্গে সত্বর আসুন।–এই বলে সে উঠে চলতে শুরু করল।

রাজ্যলোভে আকৃষ্ট কর্পূরতিলকও শৃগালদর্শিত পথে যেতে যেতে মহাপঙ্কে পতিত হল। তখন হাতি বলল–সখে শৃগাল, এখন কী করি ? পাঁকে পড়ে আমি মরতে চলেছি–একবার পিছন ফিরে দেখ। শৃগাল হেসে বলল–দেব ! আমার পুচ্ছ ধরে উঠতে চেষ্টা করুন ; আমার মতো লোকের কথায় যখন আপনি বিশ্বাস করেছেন–তখন সেই দুঃখ ভোগ করুন–যার কোন প্রতিকার নেই। শাস্ত্রে বলেছে–

যত দিন সৎসঙ্গে থাকবে তত দিন বেঁচে থাকবে, যখন অসৎসঙ্গে পড়বে তখন ধ্বংস অনিবার্য।

তারপর মহাপঙ্কে নিপতিত সেই হাতিকে শৃগালেরা ভক্ষণ করল। তাই আমি বলছিলাম–কৌশলে যা সম্ভব, শক্তিতে তা সম্ভব হয় না।

তারপর সেই দূতীর উপদেশে রাজপুত্র চারুদত্ত নামক সেই বণিকপুত্রকে নিজের সেবকরূপে নিযুক্ত করল ; পরে তাকে গোপন ব্যাপারে নিযুক্ত করা হল।

একদিন সেই রাজপুত্র স্নান করে নানা অনুলেপন দ্রব্যে প্রসাধন করল ; পরে স্বর্ণ ও রত্নালংকারে ভূষিত হয়ে (চারুদত্তকে) বলল–আমি একমাসব্যাপী গৌরীব্রতের

অনুষ্ঠান করব। তুমি এখানে প্রতি রাত্রে একটি কুলীন যুবতী কন্যাকে আমার হাতে অর্পণ করবে। আমি যথোচিত শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী তার পুজো করব।

চারুদত্তও সেইরূপ নবযুবতী সংগ্রহ করে আনতে লাগল—তারপর আড়ালে থেকে দেখতে লাগল—সে কী করে।

তুঙ্গবল অবশ্য সমাগতা যুবতীকে স্পর্শ করত না—দূর থেকে বস্ত্রালংকার ও গন্ধচন্দনে তাকে পুজো করে রক্ষকের সঙ্গে গৃহে পাঠিয়ে দিত।

এই সব দেখে বণিকপুত্রের বিশ্বাস হল। সে তখন লোভাকৃষ্ট হয়ে নিজের বধূ লাবণ্যবতীকে এনে তার হাতে সমর্পণ করল।

প্রাণপ্রিয়া লাবণ্যবতীকে চিনতে পেরে ব্যস্ত হয়ে তুঙ্গবল উঠে এসে তাকে গভীর আলিঙ্গন করল। (আবেশে) তার দুই চক্ষু নিমীলিত—সেই অবস্থায় সে তাকে পর্যংক টেনে এনে তার সঙ্গে বিলাস শুরু করল।

বণিকপুত্র তখন চিত্রলিখিতের ন্যায় নিস্পন্দ—কী করবে সেই বোধও তার ছিল না। গভীর বিষাদে মগ্ন হল চারুদত্ত। তাই আমি বলছিলাম—নিজের চোখে ভার্যার কুচমূল অন্যের দ্বারা মর্দিত হতে দেখে—আর কী বলব!

তার (হিরণ্যকের) হিতবাক্য উপেক্ষা করে, ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে মন্থর সেই জলাশয় ত্যাগ করে যাত্রা করল। হিরণ্যক প্রভৃতিও অনিষ্ট আশংকা করে স্নেহবশতই তাকে অনুসরণ করল। স্থলপথে যাচ্ছে মন্থর, বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক ব্যাধ। তাকে দেখতে পেয়ে সে তাকে তার ধনুতে আবন্ধ করে চলতে লাগল। ভ্রমণের ক্লেশে, ক্ষুধা ও পিপাসায় সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল।

মৃগ, কাক ও মূষিকও গভীর দুঃখে অভিভূত হয়ে তার অনুসরণ করতে লাগল। হিরণ্যকের বিলাপ শোনা গেল—সাগরের মতোই একটি দুঃখের পারে যেতে না যেতেই আর একটি বিপদ উপস্থিত! দুর্বলতার সুযোগে দুঃখও যেন বহুগুণিত হতে থাকে।

অকৃত্রিম বন্ধু ভাগ্যবশেই জুটে থাকে। তার অকৃত্রিম সৌহার্দ বিপদেও আমাদের ত্যাগ করে না।

অকৃত্রিম মৈত্রীর উপরে মানুষের যে বিশ্বাস তা মাতা, ভার্যা, সহোদর ভ্রাতা বা পুত্রেও দেখা যায় না।

বার বার চিন্তা করে হিরণ্যক বলল—আহা কী দুর্ভাগ্য!

এই জীবনেই আমি কত অবস্থার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি—যেন জন্ম ও জন্মান্তরের পালা; তারা আমার নিজেরই কর্মের ফলে উদ্ধৃত, ভালো কি মন্দ যাই হোক—একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে তারা ঘটেছে।

অথবা এই রকমই তো হবার কথা—

এই দেহ সংকটের অধীন, ধনসম্পদ দুর্ভাগ্যের উৎস, মিলন বিচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত,—যা কিছু সৃষ্টি সবই ক্ষণস্থায়ী।

পুনরায় চিন্তা করে হিরণ্যক বলল—দুই-অক্ষর-বিশিষ্ট 'মিত্র'—এই রত্ন কে সৃষ্টি করেছিল? এই রত্ন দুঃখ ও শত্রুর ভয় থেকে ত্রাণ করে; এই রত্ন সকল আনন্দ ও আশ্বাসের আশ্রয়। তাছাড়া—

দৃষ্টির সম্মুখে প্রীতির উৎস, হৃদয়ের আনন্দভূমি মিত্রের সঙ্গে সুখ-দুঃখের সমভাগী—এমন মিত্র দুর্লভ। কিন্তু অন্য বন্ধুরা, যারা ধনলোভে আকৃষ্ট হয়ে সম্পৎ-

কালেই কেবল মিলিত হয়–তারা সর্বত্র সুলভ। বিপদই একমাত্র কষ্টিপাথর যাতে তাদের আন্তরিকতা পরীক্ষা করা চলে।

এইভাবে নানাভাবে বিলাপ করে হিরণ্যক, চিত্রাঙ্গ এবং লঘুপতনক বলল–এই ব্যাধ বন থেকে নির্গত হবার আগেই মন্থরকে মুক্ত করতে যত্নবান হও। তারা দুজনে বলল–কী করতে হবে শীঘ্র বল। হিরণ্যক বলল–চিত্রাঙ্গ জলের কাছে গিয়ে নিজেকে মৃতের মতো দেখিয়ে পড়ে থাকুক। কাক তার উপরে বসে চঞ্চু দিয়ে কিছু ঠুকরে খাবার অভিনয় করুক। ব্যাধ নিশ্চয়ই কচ্ছপকে রেখে মৃগের লোভে সেখানে ছুটে যাবে। আমি তখন মন্থরের বন্ধন ছিন্ন করে দেব। ব্যাধ কাছে আসলেই তোমরা পালাবে।

চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক সত্বর গিয়ে তাই করল। শ্রান্ত ব্যাধ জল পান করে গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিল। সে দেখতে পেল হরিণকে। তখন খুশি হয়ে সে কাটারি হাতে মৃগের কাছে ছুটে গেল। এই অবসরে হিরণ্যক এসে মন্থরের বন্ধন ছিন্ন করল। কূর্ম ছুটে গিয়ে জলাশয়ে প্রবেশ করল। মৃগ ব্যাধকে আসতে দেখে ছুটে পালাল।

ফিরে এসে ব্যাধ যখন তরুতলে উপস্থিত হল–তখন কূর্মকে সেখানে দেখতে না পেয়ে ভাবল–আমি না ভেবে কাজ করেছি–এই ফলই আমার প্রাপ্য। কেননা–

ধ্রুব বস্তু ত্যাগ করে যে অধ্রুবের পিছনে ছুটে যায় ধ্রুব তার নষ্ট হয়ে যায়– অধ্রুব তো নষ্ট হয়েই আছে।

তারপর নিজের কর্মবশে নিরাশ হয়ে সে নগরে ফিরে গেল। মন্থর প্রভৃতিও (মন্থর, লঘুপতনক, চিত্রাঙ্গ, হিরণ্যক) স্বস্থানে গিয়ে সুখে থাকত লাগল।

রাজপুত্রেরা আনন্দিত চিত্তে বলে উঠল–আমরা সকলেই শুনেছি, শুনে আমরা সুখী। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

বিষ্ণুশর্মা বললেন–এতে তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, তা ছাড়াও এই হোক–

সৎপুরুষ মিত্র লাভ করুক, জনপদবাসীরা লক্ষ্মী লাভ করুন ; রাজগণ সতত স্বধর্মে থেকে পৃথিবী শাসন করুন ; রাজনীতিজ্ঞের নীতি নবোঢ়া বধূর মতো তোমাদের আনন্দ-বিধান করুক। ভগবান চন্দ্রার্ধ-চূড়ামণি (যার মাথার চূড়ায় অর্ধচন্দ্র, শিব) জন-সাধারণের কল্যাণ বিধান করুন।

সুহৃদভেদ

তারপর রাজপুত্রেরা বলল—আর্য ! মিত্রলাভের কথা আমরা শুনেছি ; এখন আমরা সুহৃদ্ভেদের কথা শুনতে চাই।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'সুহৃদ্ভেদ' অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদের কথা তাহলে শোন। এর প্রথম শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে—

সিংহ এবং বৃষের মধ্যে বনে যে-প্রণয় বর্ধিত হচ্ছিল তা নষ্ট করে দিল এক ধূর্ত আর অতিলোভী শৃগাল।

রাজপুত্রেরা প্রশ্ন করল—কেমন করে ?

বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন—দক্ষিণদেশে সুবর্ণবতী নামে এক নগরী ছিল ; সেখানে বাস করত বর্ধমান নামে এক বণিক। সে প্রচুর বিত্তশালী ছিল—কিন্তু অন্য আত্মীয়দের অতি সমৃদ্ধ দেখে অর্থবৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হল। কেননা—

নীচের দিকে তাকালে কার মহিমা না বাড়ে ? উপরের দিকে তাকালে সকলেই নিজেদের দরিদ্র মনে করে থাকে।

তাছাড়া, বিপুল ধনের অধিকারী হলে ব্রাহ্মণ হত্যাকারীও সমাজে পূজিত হয়, কিন্তু চন্দ্রতুল্য বংশে জন্মগ্রহণ করে অর্থ না থাকায় লোকে অবজ্ঞাত হয়।

আর একটি কথা, যুবতী নারী যেমন বৃদ্ধ স্বামীকে আলিঙ্গন করতে চায় না, তেমনি যে অলস, যার উদ্যোগ নেই, যে পরিশ্রমী নয়, যে দৈবনির্ভর তাকে লক্ষ্মীদেবী অনুগ্রহ করেন না। আরও একটি কথা—

আলস্য, স্ত্রীসেবা, রোগভোগ, জন্মভূমির প্রতি আসক্তি, সন্তোষ ও ভীরুতা—এই ছয়টি মহত্ত্বের বাধা স্বরূপ। কারণ—

সামান্য ধনেই তৃপ্ত হয়ে যদি কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে, মনে হয় বিধাতা নিজের কর্তব্য করা হয়েছে ভেবে তার সেই ধনের আর বৃদ্ধি ঘটাতে চান না। তাছাড়া—

কোন সীমন্তিনী যেন উৎসাহহীন, আনন্দহীন শক্তিহীন শত্রুর আনন্দবর্ধক এমন পুত্রের জন্মদান না করেন।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যা অলব্ধ তা লাভ করবে, যা লব্ধ তা যত্নে রক্ষা করবে। যা সঞ্চিত তা উপযুক্ত পাত্রে দান করবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যা অলব্ধ তা যদি কেউ কামনা না করে, পাওয়ার জন্যে যদি কোন উদ্যোগ না করে, নিষ্ক্রিয় থেকে তা লাভ করতে পারে না ; যা লব্ধ তার যদি যথোচিত যত্ন না করা হয় তা বিপুল সম্পত্তি হলেও একদিন নষ্ট হয়ে যাবে, অল্প ব্যবহারেও একদিন অঞ্জনের মতোই তার ক্ষয় হবে—ভোগ না করা হলেও তা অর্থহীন। শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে—

সেই ধনে কী প্রয়োজন যা মানুষ দান করে না। ভোগও করে না ; যে শক্তি শত্রুকে বাধা দিতে পারে না সেই শক্তি থাকার কী প্রয়োজন ? শাস্ত্রজ্ঞানের কী সার্থকতা যদি কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন না করে ? আত্মার কী গৌরব যদি ইন্দ্রিয়গুলি সংযমিত না হয় ? তাছাড়া—

অঞ্জনের ক্ষয় আর উইঢিবির সঞ্চয় দেখে দান, অধ্যয়ন এবং অন্যান্য কাজে

এক-একটি দিন সার্থক করে তোলা উচিত। কারণ–

বিন্দু বিন্দু জল পড়ে একটি ঘট পূর্ণ হয় ; এই নীতি সমস্ত বিদ্যা, ধর্ম সঞ্চয় ও ধনার্জনে–প্রয়োগ করা চলে।

দান নেই, উপভোগ নেই–এইভাবেই যার দিন যায় সে কর্মকারের চামড়ার জাঁতার মত্যো–শ্বাস ফেলে কিন্তু জীবনীশক্তিহীন।

এই সব চিন্তা করে নন্দক ও সঞ্জীবক নামে দুই বৃষকে গাড়িতে যোজনা করে বাণিজ্যের জন্যে কাশ্মীরে চলে গেল।

যে সমর্থ তার কাছ গুরুভার আর কী। ব্যবসায়ীদের পক্ষে দূরত্ব আর কোথায় ? জ্ঞানীদের পক্ষে বিদেশ কী ? যে মিষ্টভাষী তার কাছে পর আর কে ?

সে যখন যাচ্ছিল তখন সুদুর্গ নামক একটি বিশাল অরণ্যে সঞ্জীবক জানু ভেঙে পড়ে গেল। তাকে দেখে বর্ধমান ভাবল–নীতিজ্ঞ পুরুষ যেভাবেই চেষ্টা করুক না, বিধাতার মনে যা আছে সেই ফল তাকে পেতেই হবে। তাছাড়া–

চিত্তের অস্থিরতা সকল সময়েই ত্যাগ করা উচিত ; এই অস্থিরতা সকল কাজেই বাধা। সুতরাং অস্থিরতা ত্যাগ করে ঈপ্সিতবিষয়ে সিদ্ধির জন্যে উদ্যোগী হতে হবে।

এই চিন্তা করে সঞ্জীবককে সেখানে ফেলে রেখে বর্ধমান নিজে ধর্মপুর নামক নগরে গিয়ে অন্য একটি বিশালকায় বৃষ কিনে আনল–এবং শকটে জুড়ে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। এদিকে সঞ্জীবকও তিনটি খুরে ভর দিয়ে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল। কেননা–

কেউ সমুদ্রে নিমগ্ন হলেও, পর্বত থেকে পতিত হলেও কিংবা তক্ষক কর্তৃক (মহাবিষধর সর্প) দষ্ট হলেও, যদি আয়ু থাকে তবে তা তার প্রাণশক্তিকে অক্ষত রাখে।

মৃত্যুর সময় না এলে শত শরে বিদ্ধ হলেও কোন প্রাণী মরে না ; আবার সময় এলে সামান্য কুশাগ্রে ক্ষত হলেও প্রাণত্যাগ করে।

দৈব যদি রক্ষা করে তবে অন্যভাবে অরক্ষিত হলেও সে বেঁচে থাকে–আবার দৈব যদি আঘাত করে, সুরক্ষিত থেকেও তার মৃত্যু ঘটে ; অনাথ বলে বিসর্জিত হলেও বাঁচে, গৃহে থেকে অনেক যত্ন সত্ত্বেও প্রাণী প্রাণত্যাগ করে।

দিন যেতে লাগল। এদিকে সঞ্জীবক ইচ্ছামতো আহার-বিহার করায় তার দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। সে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গর্জন করতে লাগল। সেই বনে পিঙ্গলক নামে এক সিংহ বাস করত–নিজের বাহুবলেই সেই বনে সে রাজ্যসুখ উপভোগ করছিল। শাস্ত্রে বলেছে–

পশুরা সিংহের কোন অভিষেক বা অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান করে না। সে বাহুবলেই রাজ্যলাভ করে, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অন্য সব পশুর উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

একদিন সেই সিংহ পিপাসার্ত হয়ে জল খেতে এলো যমুনার তীরে ; সেইখানে সে সঞ্জীবকের গর্জন শুনতে পেল–যেন অকালের মেঘগর্জন. এমন গর্জন সে এর আগে আর শোনে নি। তা শুনে সে জল না খেয়েই সচকিত চিত্তে নিজের বাসস্থানে ফিরে এলো। সে নীরবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল–ব্যাপারটা কী! তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেল করটক আর দমনক নামে দুই শৃগাল–আর মন্ত্রিপুত্র। তাকে সেই অবস্থায় দেখে দমনক করটককে বলল–সখে করটক, প্রভু জলপান করতে এলেন, জল না পান করেই সচকিত চিত্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন–কেন বলতো ?

করটক বলল–বন্ধু দমনক! আমার মতে এর সেবাই করা উচিত নয় ; তাই যদি হয়

তবে ইনি কী করেন বা না করেন তা জেনে আমাদের লাভ কী? কারণ এই রাজা বিনা অপরাধে আমাদের অবজ্ঞা করে এসেছেন আর তার জন্যে আমরা কত দুঃখ পেয়েছি।

সেবকেরা সেবা করে কিছু ধন উপার্জন করতে চায়; কিন্তু দেখ কী তারা করেছে! মূঢ় সেবকেরা তাদের দেহের স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত হারিয়েছে। কেননা–

এই পরাশ্রিত সেবকেরা যে শীত, বায়ু বা উত্তাপের ক্লেশ সহ্য করে তার সামান্য অংশ ভোগ করেই জ্ঞানী ব্যক্তি তপস্যা করে সুখী হতে পারেন। তাছাড়া–

কারও জন্মের সার্থকতা তো এইখানেই যে, সে স্বাধীন জীবন যাপন করে কিনা। যারা পরাধীন–যদি বলা হয় তারা বেঁচে আছে তবে মৃত কারা?

আরও দেখ,–এসো, চলে যাও, নত হও, ওঠ, কথা বল, চুপ করে থাক–আশাগ্রস্ত প্রার্থীদের নিয়ে এইভাবেই ধনীরা খেলা করে থাকেন।

নির্বোধেরা অর্থলাভের জন্যেই গণিকার মতো নিজেদের দেহ সজ্জিত করে পরের প্রয়োজনের উপকরণ হয়ে থাকে। কারণ–

প্রভুর যে দৃষ্টি স্বভাবতই চঞ্চল এবং যা অশুচির উপরেও পড়ে, সেই দৃষ্টিকেই কামনা করে সেবকের দল। আরও একটি কথা–

যদি কোন সেবক নীরব থাকে তবে তাকে বলা হয় মূর্খ; যদি হয় বাক্যনিপুণ তাকে বলা হবে বাতুল বা বাচাল; যদি সহিষ্ণু হয়, বলা হবে ভীরু; যদি সহিষ্ণু না হয় তবে বলা হবে 'অনভিজাত'; যদি প্রভুর পাশে থাকে তবে সে হবে ধৃষ্ট, যদি দূরে থাকে সে হবে কাপুরুষ। বস্তুত সেবাধর্ম অত্যন্ত জটিল–যোগীদেরও অগম্য।

বিশেষত–সে নত হয় উত্থানের জন্যে, নিজের জীবন দেয় যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে, দুঃখভোগ করে সুখলাভের জন্যে। সেবকের চেয়ে মূর্খ আর কে?

দমনক বলল–সখে, এই সব চিন্তা তুমি মনেও ঠাঁই দিও না।

বড় বড় রাজাদের আমরা কেন যত্ন করে সেবা করব না? তারা সন্তুষ্ট হলে অচিরেই আমাদের কামনা পূরণ করে থাকেন।

আরও দেখ,–যারা সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা কেমন করে সেই সম্পদ পাবে যার ফলে তাদের মাথার উপরে চামর শোভা পাবে, দণ্ডের উপরে থাকবে শ্বেত রাজছত্র এবং সেইসঙ্গে অশ্ব ও হস্তীর বাহিনী?

করটক বলল–তাহলেও, আমাদের এই সব ব্যাপারে থাকবার দরকার কী? কারণ, যার যেটা বিষয় নয় তার সেটা নিয়ে ব্যস্ততা সর্বদা পরিত্যাজ্য। দেখ–যে মানুষ তার যেটি ব্যাপার নয় তা নিয়ে যদি মাথা ঘামাতে যায়, সেই কীলক-উৎপাটনকারী বানরের মতোই সে নিহত হয়ে ভূমিশায়ী হয়।

দমনক প্রশ্ন করল–সে আবার কী?

করটক বলতে লাগল–

কথা ॥ এক

মগধদেশে ছিল ধর্মারণ্য (ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে নির্দিষ্ট অরণ্য)–তারই নিকটবর্তী স্থানে শুভদত্ত নামে এক লেখকশ্রেণীর ব্যক্তি একটি মন্দির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেখানে একটি কাষ্ঠখণ্ড করাত দিয়ে কিছুদূর কাটা হয়েছিল–সূত্রধর তার মধ্যে একটি কীলক প্রবেশ করিয়ে রেখেছিল।

এর পরেই এক বিশাল বানরবাহিনী খেলা করতে করতে সেখানে এলো। একটি বানর মৃত্যুচালিত হয়েই যেন সেই কীলক দুই হাতে ধরে উপবেশন করল। তার দেহের লম্ববান মুষ্কদ্বয় সেই বিদীর্ণ কাষ্ঠদণ্ডদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর সে স্বাভাবিক চপলতা-বশত বিশেষ যত্নে সেই কীলক ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। কীলক টেনে আনা মাত্র—কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে তার মুষ্কদ্বয় পিষ্ট হয়ে চূর্ণ হয়ে গেল। এইভাবে সেই বানরের মৃত্যু হল।

তাই বলছিলাম—যার যা ব্যাপার নয়, সেই ব্যাপারে হাত লাগালে বানরের মতো অবস্থাই ঘটবে।

দমনক বলল—তবু প্রভুর কাজের উপর সেবকের লক্ষ্য রাখা উচিত।

করটক বলল—প্রধানমন্ত্রী সর্বাধিকারে নিযুক্ত আছেন তিনিই রাখবেন।

দেখ,—প্রভুর কল্যাণকামনায় যে পরাধিকার চর্চা করে—সে দুঃখ ভোগ করে—ঠিক যেমন চিৎকার করতে গিয়ে গর্দভ প্রহৃত হয়েছিল।

দমনক প্রশ্ন করল—তার মানে?

করটক বলতে লাগল—

কথা ॥ দুই

বারাণসীতে কর্পূরপটক নামে এক রজক বাস করত। একদিন সে তার যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘকাল রতিক্রীড়া করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল। এর পরে গৃহদ্রব্য হরণ করতে এক চোর প্রবেশ করল। তার গৃহ-প্রাঙ্গণে এক গর্দভ আবদ্ধ অবস্থায় ছিল, একটি কুকুরও উপবিষ্ট ছিল। তখন গর্দভ কুকুরকে বলল—সখে, এ তো তোমার কাজ। কেন তুমি উচ্চ-শব্দ করে প্রভুকে জাগিয়ে দিচ্ছ না?

কুকুর বলল—আমার কর্তব্য নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। তুমি কি জানো না আমি দিবারাত্রি তার গৃহরক্ষা করি; দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত থেকে এখন আর সে আমার উপযোগিতা ভুলে গেছে। তাই আমার খাদ্যের ব্যাপারেও সে উদাসীন। কারণ বিপদ না দেখলে প্রভুরা ভৃত্যের সম্পর্কে উদাসীন হয়েই থাকে।

গর্দভ বলল—ওরে বর্বর শোন—কাজের সময়ে যে পুরস্কার চায় সে কুৎসিত ভৃত্য, সে কুৎসিত বন্ধু—

কুকুর বলল—কার্যকালে যে ভৃত্যদের মধুর সম্ভাষণ করে সে কুৎসিত প্রভু।

কারণ, আশ্রিতপালনে, প্রভুসেবায়, ধর্মানুষ্ঠানে ও পুত্রোৎপাদনে কোন প্রতিনিধি-ব্যবস্থা চলে না।

তখন গর্দভ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল—ওরে দুষ্টবুদ্ধি, তুই পাপী, বিপদের মুহূর্তে তুই প্রভুকার্যে উপেক্ষা করিস? বেশ—প্রভু যাতে জেগে ওঠেন সেই ব্যবস্থা আমি করব।

কারণ, পিঠের দ্বারা সূর্যকিরণ ভোগ করবে, অগ্নিকে উদরের দ্বারা, প্রভুকে সর্বপ্রকারে আর পরলোককে পবিত্র চিত্তে।

এই কথা বলে গর্দভ উচ্চকণ্ঠে চিৎকার শুরু করল। তার চিৎকারে জেগে উঠে নিদ্রাভঙ্গজনিত ক্রোধে প্রভু লগুড় দিয়ে গর্দভকে প্রহার করতে লাগল।

তাই আমি বলছিলাম—পরাধিকার চর্চা করতে গেলে গর্দভের মতো অবস্থা হবে। দেখ, শিকার খুঁজে আনাই আমাদের কাজ—সুতরাং নিজের কাজেই মন দাও। (একটু চিন্তা

করে) কিন্তু আজ সেই চর্চারও প্রয়োজন নেই। আমাদের ভক্ষণের পরে যথেষ্ট আহার অবশিষ্ট আছে।

দমনক সক্রোধে বলল—কী! তুমি কি কেবল আহারের জন্যেই রাজার সেবা কর? এটা তোমার অনুচিত। কেননা—পণ্ডিতেরা রাজার আশ্রয় নেন বন্ধুদের উপকার করতে, শত্রুদের অনিষ্টাচারণ করতে। নইলে, উদরপূর্তি কে না করে?

যিনি জীবিত থাকলে ব্রাহ্মণ, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন জীবনধারণ করতে পারে তারই জীবনধারণ সার্থক; নিজের জন্যে কে না জীবনধারণ করে?

তাছাড়া, যিনি জীবিত থাকলে বহু লোক বেঁচে থাকে তিনিই যথার্থ জীবিত; কাকও কি চঞ্চু দ্বারা নিজের উদর পূরণ করে না?

দেখ, কোন কোন মানুষ পাঁচ পুরাণেই (পুরাণ=ষোলপণ) দাসত্ব স্বীকার করে, কেউ বা লক্ষে সন্তুষ্ট, কেউ বা লক্ষেও সুলভ নয়।

আরও দেখ,—মানবজাতির মধ্যে যখন সকলেই সমান তখন ভৃত্যত্ব নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য। কিন্তু সেখানেও যে প্রথম নয় তাকে কি জীবিতদের মধ্যে গণ্য করা চলে?

লোকে বলে, অশ্ব হস্তী ও ধাতুর মধ্যে, কাষ্ঠ পাষাণ ও বস্ত্রের মধ্যে, স্ত্রী পুরুষ ও জলের মধ্যে অনেক পার্থক্য। (অশ্বে অশ্বে পার্থক্য, কাষ্ঠে কাষ্ঠে পার্থক্য, ধাতুতে ধাতুতে পার্থক্য ইত্যাদি)।

তাছাড়া, স্বল্প স্নায়ু ও মেদে মলিন ও মাংসহীন হাড়খণ্ড পেয়ে কুকুর সন্তোষ লাভ করে, কিন্তু এতে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না; সিংহ অংকাগত শৃগালকে ত্যাগ করে, হস্তীকে বধ করে। সকলেই দুরবস্থায় পড়লেও নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী ফল পেতে চায়।

সেবিত হওয়ার যোগ্য এবং সেবক হওয়ার যোগ্য—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যও দেখ—লেজনাড়া, চরণতলে লুণ্ঠন, মাটিতে পড়ে মুখ ও উদর প্রদর্শন—এ সমস্তই খাদ্যদাতা পুরুষের সামনে কুকুর করে থাকে; গজরাজ কিন্তু ধীরভাবে দেখে দেখে শত শত চাটু-বাক্য উচ্চারিত হওয়ার মধ্যেই খেতে থাকে।

আরও দেখ—যারা জীবন কী তা জানেন তারা তাকেই জীবন বলেন যা ক্ষণমাত্রের জন্যে হলেও গৌরবের সঙ্গে যাপিত হয় এবং যা জ্ঞান, শক্তি ও যশের দ্বারা সবল সময়েই শোভিত। নইলে, কাকও তো দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে আহার গ্রহণ করে।

আর একটি কথা,—যে নিজের পুত্রের প্রতি, গুরু, ভৃত্য বা দরিদ্রের প্রতি কিংবা আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া না করে পৃথিবীতে তার জীবনের কী ফল? কাকও তো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে আর খাদ্য গ্রহণ করে!

আরও একটি কথা,—যে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে পারে না, যে শ্রুতি-বিহিত বিধিগুলি তুচ্ছ করে, উদরপূর্তিই যার একমাত্র কামনা—সেই মানব-পশুর সঙ্গে আর সাধারণ পশুর পার্থক্য কোথায়?

করটক বলল—আমরা তো অপ্রধান কর্মচারী, এই সব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে আমাদের কী লাভ?

দমনক বলল—অমাত্যগণ প্রধান বা অপ্রধান পদ লাভ করে অল্পকাল মধ্যেই।

কারণ—এই পৃথিবীতে কেউ অন্যের প্রতি উদার হয় না, কেউ অন্যের ঈপ্সিত হয় না, বা কেউ কারো নিকট দুর্বৃত্ত বলে মনে হয় না। মানুষের নিজের কর্মই তাকে গৌরবের পথে বা বিপরীত পথে চালিত করে। কারণ—

পর্বতের উপরে শিলা অনেক কষ্টেই স্থাপিত হয়, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নীচে নিক্ষিপ্ত হয়। সেইরূপ গুণদোষের ক্ষেত্রেও।

মানুষ নিজের কর্ম দ্বারাই নীচ থেকে নীচে নেমে যায় অথবা উপরে ওঠে—যেমন কূপের খনক অথবা দেওয়ালের নির্মাতা।

সুতরাং হে সখে, মানুষের নিজের রূপ নির্ভর করে তার কর্মের উপর।

করটক বলল—এখন তুমি কী বল ?

দমনক বলল—প্রভু পিঙ্গলক কোন কারণে ভীত হয়ে ফিরে এসে বসে আছে।

করটক বলল—আসল ব্যাপারটা কী তুমি জানো ?

দমনক বলল—এখানে না-জানার কী আছে ? লোকে বলে—

বাক্যে প্রকাশিত অর্থ পশুও বুঝতে পারে ; অশ্ব ও হস্তী আদেশ পেলেই ভার বহন করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাক্যে প্রকাশিত না হলেও অর্থ উপলব্ধি করতে পারে—বুদ্ধির ফলই হল অন্যের গুপ্ত চিন্তার জ্ঞানলাভ।

আকার, ইঙ্গিত, চলন, কর্ম, কথা, চোখ ও মুখের বিকৃতি—এ সকলের দ্বারাই অন্তর্গত মনের পরিচয় মেলে।

সুতরাং এই ভীতির ব্যাপারে আমি আমার বুদ্ধির বলে প্রভুকে জয় করব। কারণ—

উপলক্ষ্য অনযায়ী বাক্য, সদ্ভাব অনুযায়ী কাজ, শক্তি অনুযায়ী কোপপ্রকাশ যে করতে জানে, সে-ই পণ্ডিত।

করটক বলল—সখে, তুমি সেবায় অনভিজ্ঞ। দেখ—যে অনাহূত হলেও কাছে যায়, প্রশ্ন না করলেও অনেক কথা বলে এবং নিজেকে রাজার প্রিয়পাত্র মনে করে সে মূর্খ।

দমনক বলল—ভদ্র, আমি সেবায় অনভিজ্ঞ কী করে হলাম ? দেখ—

স্বভাবতই কেউ সুন্দর বা অসুন্দর নয়। যা মানুষের কাছে রুচিকর তাই তার কাছে সুন্দর। কারণ—

যার যেমন মনের ভাব—সে সেই ভাব অনুযায়ী আচরণ করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে শীঘ্রই নিজের বশীভূত করে থাকেন। আরও দেখ—

যখন প্রশ্ন করা হবে—'কে এখানে' ? সে বলবে—'আমি, আদেশ করুন'। তারপর যথাশক্তি সে সেই আদেশকে কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করবে। তাছাড়া—

যার ইচ্ছা সামান্য, যে ধৈর্যশালী, যে প্রাজ্ঞ এবং যে ছায়ার মতো প্রভুর অনুগামী সে-ই রাজপ্রাসাদে বাসের যোগ্য।

করটক বলল—হয়তো অবসর না বুঝে কাছে যাওয়ার জন্যে প্রভু তোমাকে উপেক্ষা করবেন। সে (দমনক) বলল—তাই হোক। তবু সেবক তার প্রভুর কাছেই থাকবে।

কারণ—অপরাধ হবে এই চিন্তায় কাজ আরম্ভ না করা কাপুরুষের লক্ষণ ; অজীর্ণ হবে এই ভেবে কে ভোজন ত্যাগ করে ? দেখ—

যে আসন্ন তাকে নৃপতি অনুগ্রহ করে থাকেন—সে বিদ্যাহীন, অকুলীন বা দুরাচার—যে-ই হোক না কেন। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে রাজা, স্ত্রীলোক অথবা লতা—যে পাশে থাকে তাকেই বেষ্টন করে।

করটক বলল—সেখানে গিয়ে কী বলবে তুমি ?

দমনক বলল—শোন। প্রথমে জানব, প্রভু আমার প্রতি বিরক্ত না অনুরক্ত। করটক বলল—তা জানার কী কী লক্ষণ ? দমনক বলল—শোন—

দূর থেকে দেখা, মৃদু হাসি, কুশল প্রশ্নে অধিক আগ্রহ, পরোক্ষেও গুণকীর্তন, প্রিয়বস্তুর মধ্যে স্মরণ করা, সেবক না থাকা অবস্থাতেও অনুরক্তি, প্রিয়বাক্য সহ দান, দোষের মধ্যেও গুণাবিষ্কার—এইগুলি প্রভুর প্রসন্নতার লক্ষণ। আর—

বিলম্ব করা, আশা দেওয়া কিন্তু পূর্ণতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা—বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইগুলিকেই বিরক্ত প্রভুর লক্ষণ জানবে।

এই কথাগুলি মনে রেখে যাতে প্রভু আমার বশীভূত হন আমি সেই ভাবেই কথা বলব। কারণ—

বাধাগুলোকে পূর্বেই দেখে উপায়ের প্রয়োগে যে ব্যর্থতা আর বিবেচনাপূর্বক উপায় প্রয়োগে এবং সুনীতি প্রয়োগে যে সিদ্ধি—তার সুস্পষ্ট চিত্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

করটক বলল—তাহলেও উপযুক্ত সুযোগ না এলে তুমি কথা বোলো না। কারণ—

বৃহস্পতিও অকালে বাক্য উচ্চারণ করলে বিবেচনাশক্তির অভাবের জন্যে নিন্দিত হয়ে অশেষ কলঙ্কের ভাগী হয়ে থাকেন।

দমনক বলল—সখে, ভয় পেয়ো না। অবসর না বুঝে আমি কোন কথাই বলব না।

কারণ—যখন বিপদ আসন্ন, যখন প্রভু ভ্রান্ত পথে চলেছেন কিংবা যখন কার্য সাধনের উপযুক্ত কাল অতীত হয়ে যাচ্ছে—তখনই প্রভুর কল্যাণকামী সেবক জিজ্ঞাসিত না হলেও কথা বলবেন।

যদি উপযুক্ত অবসর এলেও আমি মন্ত্রণা না দিই তবে আমি মন্ত্রিত্বের অনুপযুক্ত। কারণ—যে-গুণের জন্যে জীবিকা নির্বাহ হয়, যার জন্যে সজ্জন সংসারে তাকে প্রশংসা করে থাকেন, গুণী ব্যক্তি সেই গুণ রক্ষা করে তার পুষ্টিবিধানে সচেষ্ট হবেন।

সুতরাং হে সখে, আমাকে অনুমতি দাও, আমি যাই। করটক বলল—শুভ হোক, পথ মঙ্গলময় হোক তোমার। যেমন ইচ্ছে করেছ তেমনি কর।

তারপর দমনক বিস্মিতের মতো পিঙ্গলকের নিকটে গেল। দূর থেকে দেখেই রাজা সাদরে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। দমনক তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উপবেশন করল। রাজা বললেন—অনেক দিন পরে দেখছি!

দমনক বলল—যদিও আমার মতো সেবকের প্রয়োজন মহারাজের নেই তবু উপযুক্ত সময়ে অনুজীবী সেবকের কাছে থাকাটা কর্তব্য—এই জন্যেই এসেছি। কারণ—দন্ত মার্জনার জন্যে বা কর্ণের কণ্ডুয়নের জন্যে প্রভুদের তৃণখণ্ডেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন এবং হস্তযুক্ত লোকের তো কথাই নেই।

মহারাজের যদি সন্দেহ হয় যে, চিরকাল অবজ্ঞাত থেকে আমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে—সে আশঙ্কারও কারণ নেই। কারণ, যদি মণি পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়, কাচ মস্তকে ধারণ করা হয়—যেভাবে আছে সেভাবেই থাকে, কাচ কাচই এবং মণি মণিই। তাছাড়া—

যে ধৈর্যশীল সে অবহেলিত হলেও তার বুদ্ধিনাশের আশংকা করা উচিত নয়। অগ্নিকে উল্টো করে ধরলেও তার শিখা কখনো নিম্নমুখী হয় না।

দেব! আপনি সর্বথা বিশেষজ্ঞ। কারণ, রাজা যখন সকলকে সমানভাবে বিচার করেন, তখন যারা বিশেষ শক্তির অধিকারী তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। আরও দেখুন—

মানুষ তিন প্রকার—উত্তম, অধম ও মধ্যম ; সেইভাবে তাদের তিন রকম কাজে নিযুক্ত করা উচিত। কারণ—

ভৃত্য এবং আভরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা সঙ্গত। চূড়ামণি চরণে শোভা পায় না, নূপুরও মাথায় পরা যায় না। তাছাড়া–

স্বর্ণালংকারে যে মণি নিবেশিত হওয়ার যোগ্য তা যদি সীসকে বিদ্ধ করা হয়, তখন সে আক্ষেপ করে না বা শোভা পায় না এমনও নয়। তবু যিনি এইভাবে সেই রত্ন নিবেশিত করেছেন তিনিই নিন্দার পাত্র হন। আরও দেখুন–

মুকুটে কাচ এবং চরণের অলংকারে মণি রোপিত হয়–সেখানে দোষ তো মণির নয় ; যিনি ঐভাবে নিবেশিত করেছেন তাঁর অজ্ঞতা বা বিবেচনাশক্তির অভাবই প্রতিপন্ন হয়।

এই ভৃত্য বুদ্ধিমান, এ আমার অনুরক্ত, এ সাহসী আর এর কাছ থেকে আশংকা আছে–এইভাবে যে রাজা ভৃত্যদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন, তিনি ভৃত্যদের দ্বারাই পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

অশ্ব, অস্ত্র, শাস্ত্র, বীণা, বাক্য, পুরুষ ও নারী–যে মানুষের সংস্পর্শে আসে, সেই হিসেবেই যোগ্য বা অযোগ্য বিবেচিত হয়। আরও দেখুন–

ভক্ত হলেও যদি সক্ষম না হয় তেমন ভৃত্যে কী প্রয়োজন ? আবার সমর্থ হয়েও যদি অপকারী হয় তেমন ভৃত্যে কোন প্রয়োজন নেই। আমি ভক্ত ও সমর্থ–দুই-ই। সুতরাং আমাকে আপনার অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কারণ–

রাজা যদি অবজ্ঞা করেন, ভৃত্যেরা নির্বোধ হয়ে যায়। তাদের প্রাধান্যহেতু কোন পণ্ডিত ব্যক্তি রাজার কাছে আসেন না। পণ্ডিতগণ যদি রাজ্য ত্যাগ করেন, তাহলে কোন নীতি ফলপ্রসূ হয় না ; আর নীতি যদি বিপন্ন হয় সমস্ত জগৎ অসহায় হয়ে দুঃখ ভোগ করে। আরও একটি কথা–

যিনি রাজা কর্তৃক অর্চিত লোকে তাকেই সম্মান করে ; রাজা যাকে উপেক্ষা করে তিনি সকলেরই অবহেলার পাত্র। আরও দেখুন–

বালকেও যদি যুক্তিসঙ্গত কথা বলে মনীষীদের তা গ্রহণ করা উচিত। যেখানে সূর্য অপ্রকাশ, সেখানে প্রদীপের আলো কী গ্রহণযোগ্য নয় ?

পিঙ্গলক বলল–দমনক, তুমি এ সব বলছ কেন ? আমার প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তুমি, এতকাল (হয়তো) কোন দুষ্ট লোকের কথায় বিশ্বাস করে এখানে আস নি। এখন তোমার যা বলবার বল।

দমনক বলল–দেব, একটি প্রশ্ন করতে চাই, দয়া করে উত্তর দিন। পিপাসার্ত হয়েও আপনি জলপান না করে ফিরে এলেন, দেখে মনে হয় আপনি যেন স্তম্ভিত। ব্যাপারটি কী ?

পিঙ্গলক বলল–তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই রহস্যকথা ব্যক্ত করব এমন বিশ্বাসভাজন কেউ নেই। তুমি সেই বিশ্বাসের পাত্র, সুতরাং তোমার কাছেই এ কথা বলছি, শোন–

সম্প্রতি এই বনে এমন এক প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে–যার ডাক আগে শুনি নি। সুতরাং এই বন ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। এই কারণেই আমি স্তম্ভিত হয়েছি। সেই অদ্ভুত ভীষণ গর্জন তুমিও নিশ্চয় শুনেছ। শব্দের অনুপাতে মনে হয় সেই প্রাণীর শক্তিও সাংঘাতিক।

দমনক বলল–দেব, এটি একটি ভীষণ ভয়ের কারণ বটে। আমরাও সেই শব্দ শুনেছি।

কিন্তু প্রথমে স্থান ত্যাগ ও পরে যুদ্ধের পরামর্শ যে দেয় সে অযোগ্য মন্ত্রী। কোন্ পথ অবলম্বিত হবে তা জানা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তেমন সংকটেই ভৃত্যের উপযোগিতা জানতে হবে। কেননা–

বিপদের কষ্ঠিপাথরেই মানুষ তার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও ভৃত্যদের এবং নিজের বুদ্ধি ও মানসিক সত্তার শক্তি পরীক্ষা করে নিতে পারে।

সিংহ বলল–আমার খুবই ভয় হয়েছে। দমনক পুনরায় বলল–(স্বগত) তা না হলে আর রাজ্যসুখ ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাবার প্রস্তাব আমার কাছে করলে কেন ? (প্রকাশ্যে) দেব, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ ভয় করবেন না। কিন্তু করটক প্রভৃতিদেরও আশ্বস্ত করুন (অনুগ্রহ বিতরণের দ্বারা) ; কারণ, বিপদের প্রতিকারকালে লোকের সংহতি খুবই দুর্লভ।

তারপর রাজা প্রচুর ধন দিয়ে করটক-দমনককে সম্মানিত করলেন। ভয়ের প্রতিকার করব–এই শপথ করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় করটক বলল–ভয়ের প্রতিকার সম্ভব না অসম্ভব তা না জেনে 'প্রতিকার করব' এই প্রতিকারের এই অনুগ্রহের বিশাল দান গ্রহণ করব কেন ? কারণ, কোন কিছু উপকার না করে কারও দান গ্রহণ করা অনুচিত–রাজার দান তো নয়-ই। দেখ–

তাঁর প্রসাদে লক্ষ্মী, পরাক্রমে বিজয়, ক্রোধে মৃত্যু ; তিনি সমস্ত তেজের সমষ্টি।

তাছাড়া–বালক হলেও মানুষ বলে রাজাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, মানুষের রূপে ইনি মহিমময় দেবতা।

দমনক হেসে বলল–বন্ধু তুমি চুপ করে থাক। ভয়ের কারণ আমি জেনেছি–ওটা একটা ষাঁড়ের গর্জন। আর ষাঁড় তো আমাদেরও ভোজ্য–সিংহের তো কথাই নেই। করটক বলল–তাই যদি হয় তবে প্রভুর ভয় সেখানেই দূর করলে না কেন ?

দমনক বলল–যদি প্রভুর ভয় সেখানেই দূর করতাম, এই রাজার এই 'মহাপ্রসাদ' হত কি ? তাছাড়া–

ভৃত্যদের এমন করা সঙ্গত নয় যাতে প্রভু তাদের সেবার প্রয়োজন থেকে মুক্ত হন। প্রয়োজন থেকে মুক্ত করলে ভৃত্যের অবস্থা দধিকর্ণের মতো হতে পারে।

করটক বলল–সে আবার কী ?

দমনক বলতে শুরু করল–

কথা ॥ তিন

উত্তরদেশে অর্বুদশিখর নামে এক পর্বত–সেখানে থাকত এক সিংহ–নাম মহাবিক্রম। সে যখন পর্বতের গুহায় শুয়ে থাকত এক মূষিক এসে প্রতিদিন তার কেশরের অগ্রভাগ কেটে দিত। কেশরের অগ্রভাগ ছিন্ন দেখে সেই সিংহ ক্রুদ্ধ হল ; কিন্তু গর্তের মধ্যস্থিত মূষিককে না পেয়ে ভাবল–

যে শত্রু ক্ষুদ্র এবং শক্তির সাহায্যে আয়ত্ত করা যায় না তাকে বধ করতে হলে তার সমান একটি যোদ্ধাকেই নিয়োগ করতে হয়।

এই ভেবে সে গ্রামে গেল ; সেখানে বিশ্বাস উৎপাদন করে দধিকর্ণ নামক এক বিড়ালকে সযত্নে এনে মাংসাহার দিয়ে গুহায় রেখে দিল। তারপর তার ভয়ে মূষিকও আর গর্ত থেকে বাইরে আসত না। ফলে, সিংহ তার অক্ষত কেশর নিয়ে সুখে ঘুমোতে লাগল। মূষিকের শব্দ যখন সে শুনত তখনই বিশেষভাবে মাংসাহার দিয়ে সে বিড়ালকে আপ্যায়িত করত।

তারপর একদিন সেই মূষিক ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে বাইরে এসে ঘুরে বেড়াতে লাগল—আর বিড়াল তাকে দেখতে পেয়ে মেরে ফেলল। এর পর যখন সেই সিংহ গর্ত থেকে মূষিকের শব্দ আর শুনতে পেল না—তখন (বিড়ালের) আর প্রয়োজন নেই ভেবে বিড়ালকে খাদ্যদানের ব্যাপারে তার আদর বেশ শিথিল হয়ে এলো। ফলে আহারের অভাবে বিড়াল দুর্বল হয়ে পড়ল। তাই আমি বলছিলাম—নিজের প্রয়োজন থেকে প্রভুকে মুক্ত করা উচিত নয়।

তারপর দমনক ও করটক পিঙ্গলকের কাছে গেল। সেখানে তরুতলে করটক বেশ গর্বিতভাবে বসে রইল। দমনক সঞ্জীবকের কাছে গিয়ে বলল—ওরে বৃষভ, ইনি সেনাপতি করটক, রাজা পিঙ্গলক একে অরণ্যরক্ষায় নিযুক্ত করেছেন। সেনাপতি আদেশ করছেন তুমি সত্বর চলে এসো, নইলে এই অরণ্য থেকে দূরে চলে যাও ; তা না হলে বিপরীত ফল ফলবে—প্রভু ক্রুদ্ধ হলে কী ব্যবস্থা করবেন জানি না।

সঞ্জীবক দেশের রীতি ও আচার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ; সে ভয়ে ভয়ে করটকের সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। লোকে বলে—'বুদ্ধি শক্তি অপেক্ষা বড়, বুদ্ধির অভাবেই হাতির এই দশা—' ডিণ্ডিম নামক বাদ্যে যখন মাহুত আঘাত করে তখন সেই বাদ্য শব্দ করতে করতে যেন এই কথাই ঘোষণা করে।

তখন সঞ্জীবক ভীতকণ্ঠে বলল—সেনাপতে ! আমার কী কর্তব্য তা বলে দিন।

করটক বলল—যদি নিরাপদে এই বনে বাস করতে চাও, তবে প্রভুর চরণকমলে প্রণত হও।

সঞ্জীবক বলল—তাহলে আমাকে অভয় দিন, আমি যাচ্ছি। (অভয়দানের চিহ্নস্বরূপ) আপনার দক্ষিণ বাহু আমাকে দিন।

করটক বলল—ওরে বৃষভ, শোন। এই আশংকার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা—

চেদিরাজ (শিশুপাল) যে তিরস্কার করেছিলেন তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কোন কথাই বলেন নি। মেঘের গর্জনে সাড়া দিতে গিয়েই সিংহ গর্জন করে ওঠে—শৃগালের চিৎকারকে তুচ্ছ করে। তাছাড়া—

প্রবল ঝটিকা তৃণকে উন্মূলিত করে না—তারা সকল ভাবেই কোমল এবং প্রণত। কিন্তু সেই ঝড় উন্নত তরুর উপরে ধ্বংস নিয়ে আসে। যিনি মহান তিনি মহতের উপরেই শক্তি প্রকটিত করেন।

তারপর তারা দুজন সঞ্জীবককে একটু দূরে রেখে পিঙ্গলকের কাছে গেল। রাজা সাদরে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তারা প্রণাম করে উপবেশন করল।

রাজা বললেন—তুমি তাকে দেখেছ ?

দমনক বলল—দেব ! দেখেছি। আপনি যা অনুমান করেছেন ঠিক তাই। প্রাণীটি সত্যিই বিশাল ; সে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। কিন্তু সে প্রভূত বলের অধিকারী—আপনি

আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়েই তাকে দর্শন দিন। শুধু শব্দ শুনেই আপনি ভয় করবেন না। শাস্ত্রে বলেছে শব্দ শুনেই শব্দের কারণ না জেনে ভয় পাওয়া সঙ্গত নয়; ভয়ের কারণ জেনে কুট্টনী সম্মানিত হয়েছিল।

রাজা বলল—কেমন করে?

দমনক বলতে লাগল—

কথা ॥ চার

শ্রীপর্বতে ব্রহ্মপুর নামে এক নগর ছিল। এই রকম একটা জনপ্রবাদ শোনা যেত যে সেই পর্বতের শিখরে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস থাকত। একদিন ঘণ্টা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল এক চোর—তখন এক বাঘ সেই চোরটাকে মেরে খেয়ে ফেলল। তার হাত থেকে ঘণ্টা পড়ে গেল, সেই ঘণ্টা পেল বানরের দল। সেই বানরেরা সব সময় ঘণ্টা বাজাত। সেই লোকটাকে বাঘে খেয়েছে নগরবাসীরা তা দেখেছিল—এদিকে প্রতিক্ষণই ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এর পর সকলে বলতে লাগল, ঘণ্টাকর্ণই ক্রুদ্ধ হয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে আর মানুষ ধরে ধরে খাচ্ছে; এই বলে তারা নগর থেকে পালিয়ে গেল।

তখন করালা নামে এক কুট্টনী ভাবল—এই ঘণ্টাশব্দের কোন সময় ঠিক নেই; তবে কি বানরের দল ঘণ্টা বাজাচ্ছে? এই ভেবে সে নিজে আসল ব্যাপারটা জেনে রাজার কাছে গিয়ে বলল—দেব! যদি কিছু অর্থব্যয় করা হয়, আমি এই ঘণ্টাকর্ণের একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

রাজা তাকে ধন দিলেন। কুট্টনী তখন এক মন্ত্রপূত বৃত্ত এঁকে বেশ ঘটা করে গণেশ প্রভৃতির পূজা করল এবং নিজে বানরপ্রিয় ফল সঙ্গে নিয়ে বনে প্রবেশ করল।

বনে ফলগুলি সে ছড়িয়ে দিল। তখন ঘণ্টা ছেড়ে দিয়ে বানরের দল ফল নিয়ে মত্ত হল। এদিকে কুট্টনীও ঘণ্টা নিয়ে নগরে ফিরে এলো। এর পর সে হল 'সর্বজন-পূজ্যা'! তাই আমি বলছিলাম—শুধু শব্দ শুনেই ভয় পাওয়া উচিত নয়।

এর পর সঞ্জীবককে এনে সিংহকে দেখানো হল। পরে পরম সুখে সে সেখানে বাস করতে লাগল।

এর পরে কোন একদিন স্তব্ধকর্ণ নামে সিংহের এক ভাই সেখানে এলো। তাকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে রেখে পিঙ্গলক তার আহারের জন্যে পশুবধ করতে বেরিয়ে যাবে এমন সময় সঞ্জীবক প্রশ্ন করল—আজ সকালে যে পশুবধ করা হয়েছে তার মাংস কোথায়? রাজা বললেন—দমনক-করটক জানে। সঞ্জীবক বলল—আগে জেনে নিন, আছে কিনা। রাজা চিন্তা করে বললেন—না, নেই। সঞ্জীবক বলল—কী আশ্চর্য, এতগুলো মাংস ওরা দুজন খেয়েছে? রাজা বলল—খেয়েছে, কিছু অন্যভাবে খরচ করেছে, কিছু নষ্ট করেছে। প্রতিদিন এইভাবেই চলে। সঞ্জীবক বলল—আপনাকে না জানিয়েই করে? রাজা বলল—আমার সম্পূর্ণ অগোচরে এটা করা হয়। তখন সঞ্জীবক বলল—এটা উচিত নয়। শাস্ত্রে আছে, রাজার কোন বিপদ দূর করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রভুকে না জানিয়ে নিজের দায়িত্বে কোন কাজ করা অসঙ্গত। তাছাড়া—

অমাত্য হবেন কমণ্ডলুর মতো, প্রচুর নেবেন—সামান্য ত্যাগ করবেন। রাজার

যে অমাত্য মুহূর্তের মূল্য না জানে সে মূর্খ, যে কড়িকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে তাকে দরিদ্রই থাকতে হয়।

সেই অমাত্যই উত্তম যিনি অন্তত এক কাকিনী (কাকিনী=বিশ কড়ি) ভাণ্ডারে বাড়াতে জানেন। রাজার কাছে রাজভাণ্ডারই প্রাণস্বরূপ, নিজের প্রাণ সেইরূপ নয়।

আর একটি কথা, ধন ছাড়া অন্য কুলাচারের দ্বারা (যেমন বশ্যতা, বাধ্যতা, নম্রতা প্রভৃতি) নৃপতি সেবিত হবার গৌরব লাভ করেন না। নির্ধন পুরুষকে তার পত্নীও ত্যাগ করে, অন্যের কথা ওঠে না।

রাজ্যশাসনে এইটিই প্রধান দোষ–

অতিব্যয়, পরিদর্শনের অভাব, অধর্মপথে ধনোপার্জন, লুণ্ঠন ও দূরে অবস্থান– এইগুলিই রাজকোষের পক্ষে ক্ষতির কারণ।

কুবেরের মতো ধনী হলে কোন ব্যক্তি যদি আয়ের দিকে লক্ষ্য না রেখে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে থাকে তবে তাকে দরিদ্র হতে হয়।

স্তবকর্ণ বলল–শোন ভাই, এই করটক ও দমনক তোমার দীর্ঘকালের আশ্রিত– এরা সন্ধি ও বিগ্রহের অধিকারে নিযুক্ত। এদের কখনও অর্থবিভাগে নিয়োগ করা উচিত নয়। নিয়োগের ব্যাপারে আমি সামান্য যা কিছু শুনেছি, তা তোমাকে বলব।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং আত্মীয়কে অর্থাধিকারে নিয়োগ অসঙ্গত। যে অর্থ আদায় করা হয়েছে, চাপ দিলেও ব্রাহ্মণ তা দেয় না।

কোষাগারে যদি ক্ষত্রিয়কে নিয়োগ করা হয় তবে সে তরবারি দেখাবে। আত্মীয়কে নিয়োগ করলে আত্মীয়তার জোরেই সে সর্বস্ব দখল করে গ্রাস করবে।

দীর্ঘকালের সেবককে যদি নিযুক্ত করা হয় তবে সে অপরাধ করলেও শঙ্কাহীন থাকবে; সে প্রভুকে অবজ্ঞা করে নিরঙ্কুশভাবে বিচরণ করবে।

উপকারী ব্যক্তিকে অধিকার দিলে সে নিজের অপরাধ ভুলে যাবে এবং উপকারের পতাকা উড়িয়েই সর্বস্ব গ্রহণ করবে।

যে বাল্যকাল থেকে ক্রীড়াসহচর এমন লোককে মন্ত্রী করলে সে-ই রাজার মতো আচরণ করতে থাকবে এবং অতি-পরিচয় হেতু নিশ্চয়ই রাজাকে অবজ্ঞা করবে।

যে অন্তরে খল, বাইরে ক্ষমার মূর্তি–তেমন লোক সর্বপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি করবে– এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত শকুনি আর শকটার (নন্দরাজের সচিব)।

সকল সমৃদ্ধ অমাত্যকেই ভাবী কালে সংশোধন করা যায় না। জ্ঞানীদের এই নির্দেশ–অর্থের প্রাচুর্যই চিত্তকে বিকৃত করে।

উৎকোচ গ্রহণ, রাজদ্রব্যের বিনিময়, স্বজন পোষণ, অবহেলা, বিচারের অভাব ও ভোগেচ্ছা–এইগুলি অমাত্যের দোষ।

অন্যায় পথে (কর্মচারী কর্তৃক) গৃহীত অর্থের উদ্ধার, নিত্য নিযুক্তব্যক্তির কার্য পরীক্ষা, গুণানুসারে সম্মাননা ও কর্তব্যের পরিবর্তন–এইগুলো রাজার করণীয়।

নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্লিষ্ট না বলে (আত্মসাৎ করা) রাজকীয় অর্থ উদ্গিরণ করেন না; যেমন দুষ্টব্রণ না টিপলে ভিতরের দূষিত রক্ত পুঁয ইত্যাদি বার করে না।

অসৎ পথে বিত্তশালী কর্মচারীদের রাজা পীড়ন করে অর্থ আদায় করবেন। স্নান-বস্ত্র মাত্র একবার নিঙড়োলে কি অধিক জল নিষ্কাশিত হয়?

এই সমস্ত জেনে যথাকালে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পিঙ্গলক বলল–তুমি ঠিকই

বলেছ। কিন্তু এরা দুজন আমার নির্দেশ পালন করে না। স্তব্ধকর্ণ বলল—এ তো একেবারেই অসঙ্গত। কারণ—

পুত্রও যদি আদেশ লঙ্ঘন করে, তাদের ক্ষমা করা রাজার পক্ষে অনুচিত। কারণ তাহলে এমন রাজা আর চিত্রে অঙ্কিত রাজার মধ্যে পার্থক্য কী? তাছাড়া—

নিষ্কর্মা পুরুষের যশ নষ্ট হয়, অস্থিরমতি লোকের বন্ধুত্ব থাকে না। তেমনি থাকে না ইন্দ্রিয়শক্তিহীন ব্যক্তির বংশ, অর্থলোভীর ধর্ম, পাপাসক্ত ব্যক্তির বিদ্যা, কৃপণের সুখ এবং সেই রাজার রাজ্য যার অমাত্য উদাসীন। বিশেষত—

চোর, রাজকর্মচারী, শত্রু, নিজের প্রিয়জন এবং নিজের লোভ থেকে রাজা পিতার মতো প্রজাদের রক্ষা করবেন।

ভাই, সর্বদা আমার উপদেশ শুনে কাজ কর। আমিও নিয়োগকর্ম করেছি। শস্যভোজী এই সঞ্জীবককে অর্থাধিকারে নিয়োগ কর।

এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবার পর থেকে পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের পরম মৈত্রীর বন্ধনে দিন কাটতে লাগল—সকল স্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিন্ন হয়ে গেল।

দমনক ও করটক দেখল ভৃত্যদের আহারদানেও শিথিলতা প্রকট হয়ে উঠছে। তখন তারা পরস্পর আলোচনায় বসল। তখন দমনক করটককে বলল—বন্ধু, এখন কী করি? এ তো আমাদেরই দোষ। নিজের কৃত অপরাধে অনুশোচনা করাও অনুচিত। কারণ, লোকে বলে—

আমি স্বর্ণরেখা স্পর্শ করার জন্যে, দূতী নিজেকে বাঁধার জন্যে, বণিক মণি-অপহরণের ইচ্ছার জন্যে—সকলেই নিজের কৃত অপরাধে দুঃখভোগী।

করটক বলল—তার মানে?

দমনক বলতে লাগল—

কথা ॥ পাঁচ

কাঞ্চনপুর নগরে বীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর বিচার-বিভাগীয় এক কর্মচারী কোন নাপিতকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন—তখন অন্য এক সাধুর সঙ্গে এক সাধু এসে সেই নাপিতের বস্ত্রাঞ্চল টেনে ধরে বলল—একে বধ করবেন না।

রাজপুরুষেরা বলল—কেন বধ করা হবে না? সে বলল—শুনুন। এই বলে 'স্বর্ণরেখা স্পর্শ করে আমি'—ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করল।

তারা বলল—সে আবার কী?

সাধু বলতে লাগল—আমি সিংহল দ্বীপের রাজা জীমূতকেতুর পুত্র, আমার নাম কন্দর্পকেতু। আমি যখন একদিন প্রমোদ-উদ্যানে বসে ছিলাম তখন এক সমুদ্র-বণিকের মুখে শুনতে পেলাম চতুর্দশীর রাত্রিতে এই সমুদ্রের মধ্যে এক কল্পতরুর আবির্ভাব ঘটবে—তার তলে মণিকিরণবিচিত্রিত শয্যায় স্থিতা সর্বালংকারভূষিতা, লক্ষ্মীর মতো বীণা-বাদনরতা এক কন্যাকে দেখা যাবে।

আমি তখন সমুদ্র-বণিকের সঙ্গে জাহাজে উঠে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তারপর সেখানে গিয়ে শয্যায় অর্ধশয়ানা সেই অবস্থাতেই তাকে দেখলাম। তার লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে তার উদ্দেশ্যে আমি ঝাঁপ দিলাম। তারপর এক স্বর্ণনগরীতে উপস্থিত হয়ে

স্বর্ণপ্রাসাদে শয্যাশায়িতা বিদ্যাধরীসেবিতা সেই কন্যাকে দেখলাম। আমাকে দূর থেকে দেখে সে সখী পাঠিয়ে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। আমি প্রশ্ন করায় তার সখী আমাকে বলল—ইনি বিদ্যাধররাজ কন্দর্পকেলির কন্যা, এর নাম রত্নমঞ্জরী। ইনি শপথ করেছেন—স্বর্ণনগরে উপস্থিত হয়ে যিনি স্বচক্ষে সব দেখতে পারেন—পিতার অগোচরে হলেও তাঁকেই তিনি পতিত্বে বরণ করবেন। এই হল এঁর হৃদয়গত সংকল্প। তাই আপনি এঁকে গান্ধর্বরীতিতে বিবাহ করুন।

তারপর গান্ধর্ববিবাহ শেষ হল। আমি তার মধুর সংসর্গভোগে সেখানেই বাস করতে লাগলাম। একদিন সে নিভৃতে আমাকে বলল—প্রভু, তুমি তোমার ইচ্ছামতো এখানে সব ভোগ কর, কিন্তু কখনো চিত্রে অংকিত ঐ স্বর্ণরেখা নাম্নী বিদ্যাধরীকে স্পর্শ কোরো না। তারপর আমার কৌতূহল হল, আমি স্বহস্তে স্বর্ণরেখাকে স্পর্শ করলাম। তখন চিত্রে অংকিত হলেও তার চরণকমলের আঘাতে তাড়িত হয়ে আমি আমার নিজের রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম। দুঃখার্ত হয়ে আমি সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করলাম, তারপর নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে আমি এই দেশে এসেছি।

গতকাল দিনের শেষে আমি এক গোপগৃহে শুয়েছিলাম। আমি দেখলাম, গোপ যখন তার বন্ধুর সুরাবিপণি থেকে ফিরে এলো—তখন তার স্ত্রী একজন কুট্টনীর সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করছিল। সে স্ত্রীকে প্রহার করে একটা স্তম্ভের সঙ্গে তাকে বেঁধে শুতে গেল। গভীর রাত্রিতে সেই কুট্টনী এই নাপিতের বধূ আবার এসে গোপবধূর কাছে বলল—'সেই মহানুভব ব্যক্তি তোমার বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ এবং কামদেবতার শরে আহত হয়ে তোমার জন্যে মৃতপ্রায়। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে, অত্যন্ত দুঃখার্ত হয়ে আমি তোমাকে বোঝাবার জন্যে এসেছি। তাহলে আমি নিজেকে স্তম্ভে বেঁধে এখানে অপেক্ষা করি, তুমি সেখানে গিয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

এই ব্যবস্থাই হল। তখন গোপ জেগে বলল—এখন কেন তোমার জারের কাছে যাচ্ছ না? যখন কোন উত্তর এলো না, তখন 'তোমার এত দর্প যে আমার কথার উত্তরও দিচ্ছ না?'—এই বলে সে দা এনে তার নাক কেটে দিল। তারপর গোপ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে সেই গোপী ফিরে এসে দূতীকে প্রশ্ন করল—কী খবর? দূতী বলল—দেখ, আমার মুখই তোমাকে খবরটা বলবে। তারপর গোপী সেইভাবে নিজেকে বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। দূতী তার কাটা নাকের টুকরো নিয়ে নিজের গৃহে চলে গেল। প্রাতে নাপিত তার কাছে ক্ষৌরপাত্র চাইল—সে দিল একটি ক্ষুর। সম্পূর্ণ পাত্রটি না পাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে দূর থেকেই সেই ক্ষুর ছুড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে উঠল—তারপর বিচারকের কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে অভিযোগ করল—বিনা অপরাধে এ আমার নাক কেটে দিয়েছে।

এদিকে গোপের স্ত্রীকে গোপ আবার প্রশ্ন করতেই সে বলে উঠল—আঃ, দুরাচার লম্পট; কে আমার মতো মহাসতীকে কলংকিত করতে পারে? আমার ক্রিয়াকর্ম যে কত নিষ্পাপ অষ্ট লোকপালই তা জানেন। কেননা—

সূর্য-চন্দ্র, বায়ু-অগ্নি, আকাশ-পৃথিবী, জল, হৃদয়, যম, দিন ও রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম—মানুষের কর্মধারা এরাই জানেন।

আমি যদি পরমসতী হই, যদি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মনে চিন্তাও না করে থাকি তবে আমার মুখ অক্ষত হোক। আমার মুখ দেখ। তারপর যখন গোপ দীপ

জেবলে তার মুখের দিকে তাকাল তখন তার নাসিকা-যুক্ত মুখ দেখে তার চরণে লুণ্ঠিত হল--বলল—আমি ধন্য যার ভার্যা এত বড় সতী।

এখন যে বণিক এখানে উপস্থিত আছে তার কাহিনী শোন। ঘর ছেড়ে সে বারো বছর পরে মলয়পর্বত থেকে এই নগরে ফিরে এসেছিল। এখানে সে একটি গণিকার গৃহে শুয়ে ছিল। গণিকার গৃহের সামনে একটি কাষ্ঠনির্মিত বেতালের মূর্তির মাথায় একটি উৎকৃষ্ট রত্ন বসানো ছিল ; তা দেখে লোভের বশবর্তী হয়ে রাত-দুপুরে উঠে রত্নটি গ্রহণ করতে উদ্যত হল। তখন বেতালের সূত্রচালিত বাহুতে পীড়িত হয়ে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। তখন গণিকা উঠে এসে বলল—মলয়পর্বতের উপকণ্ঠ থেকে এসেছ তুমি, তোমার কাছে যা রত্ন আছে সব ওকে দিয়ে দাও নইলে ওর হাত থেকে মুক্তি পাবে না—এই ভৃত্যের স্বভাবই এই রকম। তখন এই বণিক তার সব রত্ন দিয়ে দিল। এখন সে-ও সর্বহারা হয়ে আমাদের সঙ্গে এসে মিলেছে।

তখন এই সব কথা শুনে রাজপুরুষেরা ধর্মাধিকারীকে বিচার করতে বলল। নাপিত-বধূর কেশ মুণ্ডিত করা হল—নগর থেকে বহিষ্কৃত করা হল গোপবধূকে। কুট্টনী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হল—আর বণিকের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হল। নাপিত তার গৃহে ফিরে গেল।

সেই জন্যেই আমি বলছিলাম—আমি স্বর্ণরেখা স্পর্শের জন্যে···ইত্যাদি। এই অপরাধ স্বয়ংকৃত, এখানে বিলাপ অনুচিত। (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) আমি যেমন সহসা এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম তেমনি বন্ধুত্বের বিচ্ছেদও আমি ঘটাব। কারণ—

চতুর ব্যক্তি মিথ্যাকেও সত্যরূপে প্রতিভাত করতে জানে—যেমন চিত্রকর্মে নিপুণ ব্যক্তিগণ সমতলক্ষেত্রে নিম্নোন্নত রূপ সৃষ্টি করেন। তাছাড়া—

নূতন পরিস্থিতির মধ্যেও যার বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিপদ উত্তীর্ণ হতে পারে ; তার দৃষ্টান্ত, গোপবধূ তার দুই প্রেমিকের কবল থেকে নিস্তার পেয়েছিল।

করটক প্রশ্ন করল—সে আবার কী ?

দমনক বলতে লাগল—

কথা ॥ ছয়

দ্বারবতী পুরীতে কোন এক গোপ বাস করত—তার স্ত্রী ছিল কুলটা। নগরশান্তিরক্ষকের যিনি প্রধান (দণ্ডনায়ক) তার সঙ্গে আর তার পুত্রের সঙ্গে সে গোপনে মিলিত হত।

লোকে বলে—অগ্নি বহু কাষ্ঠেও তৃপ্ত হয় না, সমুদ্র বহু নদীর ধারাতেও তৃপ্ত হয় না, সমস্ত প্রাণীকে গ্রাস করেও যমের তৃপ্তি নেই, তেমনি বহু পুরুষেও তৃপ্তি নেই সুন্দরী রমণীর। তাছাড়া—

দান, সম্মান, সরলতা, সেবা, অস্ত্র (অর্থাৎ শাস্তির ভয়), শাস্ত্রীয় উপদেশ—কিছুতেই রমণীকে জয় করা যায় না। কোন উপায়ে তাদের প্রসন্ন করা কঠিন।

কারণ—গুণের আধার, কীর্তিমান, সুন্দর, রতিশাস্ত্রে দক্ষ, ধনবান ও যুবক পতিকে ত্যাগ করে রমণীরা শীঘ্রই চরিত্রহীন ও গুণহীন পুরুষকে ভজনা করে।

তাছাড়া—বিচিত্র শয্যায় শায়িতা থেকেও রমণীগণ সেই প্রীতি লাভ করে না—যা তারা পায় পরপুরুষের সঙ্গে দূর্বাকীর্ণ শয্যাতেও শয়ন করে।

একদিন সে দণ্ডনায়কের পুত্রের সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মত্ত ছিল। এমন সময় দণ্ডনায়কও

তার সঙ্গ কামনায় সেখানে এলো। তাকে আসতে দেখে সে তার পুত্রকে ধান রাখবার পাত্রে লুকিয়ে রাখল এবং তার সঙ্গে পূর্ববৎ বিলাসে মত্ত হল।

এমন সময় তার স্বামী (গোপ) গোষ্ঠ থেকে ফিরে এলো। তাকে দেখে গোপী বলল—ওগো দণ্ডনায়ক, তুমি দণ্ড হাতে নাও, তারপর ক্রোধ প্রদর্শন করতে করতে দ্রুত চলে যাও।

তাই করা হল। গোপ গৃহে এসে স্ত্রীকে প্রশ্ন করল—দণ্ডনায়ক কোন্ কাজে এখানে এসেছিল ?

সে বলল—ইনি কোন কারণে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। পুত্রও এখানে এসে পড়েছিল, আমি তাকে ধানের পাত্রে লুকিয়ে রেখেছি। পিতা খুঁজলেন কিন্তু ঘরে দেখতে পেলেন না—তাই তিনি রাগ করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সে ধানের পাত্র থেকে বার করে পুত্রকে দেখাল। তাই বলা হয়—

স্ত্রীলোকের আহার দ্বিগুণ, তাদের উপস্থিতবুদ্ধি চতুর্গুণ, অধ্যবসায় ছয়গুণ আর কামপ্রবৃত্তি আটগুণ।

তাই আমি বলছিলাম—কার্য উপস্থিত হলে যার বুদ্ধি নষ্ট হয় না—ইত্যাদি।

করটক বলল—তাই না হয় হল। কিন্তু এদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যে মৈত্রী জন্মেছে তা কী করে ছিন্ন করবে ?

দমনক বলল—উপায় বার করতে হবে। শাস্ত্রে বলেছে—উপায়ের সাহায্যে যা করা যায় তা শক্তির দ্বারা করা যায় না। স্বর্ণহারের দ্বারাই কাক কৃষ্ণসর্পের মৃত্যু ঘটিয়েছিল।

করটক বলল—সে আবার কী ?

দমনক বলতে লাগল—

কথা ॥ সাত

কোন এক বৃক্ষে এক বায়স-দম্পতী বাস করত। সেই বৃক্ষের কোটরে ছিল কেউটে সাপ ; সে তাদের বাচ্চাগুলিকে খেয়ে ফেলত। তারপর বায়সী আবার গর্ভবতী হল—সে বায়সকে বলল—নাথ, এই তরু ত্যাগ কর। এখানে যত দিন কেউটে থাকবে তত দিন আমাদের সন্তান বাঁচবে না। কারণ—

দুষ্ট স্ত্রী, ধূর্ত বন্ধু, উদ্ধত ভৃত্য, এবং সসর্পগৃহে বাস—এগুলি মৃত্যুরই নামান্তর, এতে সন্দেহ নেই।

বায়স বলল—প্রিয়ে, ভয় পেয়ো না। বার বার আমি এর গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করেছি—এখন আর করব না। বায়সী বলল—এই শক্তিমান সাপের সঙ্গে তুমি কলহ করবে কেমন করে ?

বায়স বলল—এই আশঙ্কার প্রয়োজন নেই। কারণ—বুদ্ধি যার বল তারই—বুদ্ধিহীনের আর বল কোথায় ? দেখ, উদ্ধত সিংহকেও শশক বধ করেছিল।

বায়সী হেসে বলল—সে আবার কী ?

বায়স বলতে লাগল—

মন্দর নামক পর্বতে এক সিংহ থাকত—তার নাম দুর্দান্ত। সে সর্বদাই পশুবধ করত। তখন সব পশু মিলে সিংহকে জানাল—হে পশুরাজ! কেন একদিনে অনেক পশু বধ করছেন? যদি অনুগ্রহ করেন, আমরাই আপনার আহারের জন্যে প্রতিদিন একটি করে পশু উপহার দোব। তখন সিংহ বলল—যদি তোমাদের এই অভিমত, তবে তাই হোক।

তারপর প্রতিদিন একটি করে পশু তাকে উৎসর্গ করা হত, তাই সে খেয়ে থাকত।

একদিন এলো এক বৃদ্ধ শশকের পালা। সে ভাবল—প্রাণরক্ষার আশাতেই ভয়ের যে কারণ তার কাছে লোকে অনুনয় বিনয় করে। মৃত্যুই যখন বরণ করতে হবে তখন আর সিংহকে অনুনয় করে লাভ কী? তাহলে ধীরে ধীরেই চলি।

ওদিকে সিংহও ক্ষুধার্ত; সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলল—এত দেরি করে এসেছিস কেন? শশক বলল—দেব, আমার অপরাধ নেই। আসবার সময় পথে আর একটি সিংহ আমাকে জোর করে ধরে রেখেছিল; পরে 'আমি আবার ফিরে আসব' এই শপথ করে প্রভুর কাছে নিবেদন করতে এসেছি। সিংহ সক্রোধে বলল—দ্রুত গিয়ে দুরাত্মাকে আমায় দেখিয়ে দে কোথায় সেই দুরাত্মা।

তখন শশক তাকে দেখাবার জন্যে এক গভীর কূপের সামনে নিয়ে গেল। 'এখানে এসে আপনি নিজেই দেখুন প্রভু!' এই বলে সেই শশক কূপের জলে সেই সিংহেরই প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দিল। ক্রোধান্ধ সেই সিংহ দর্পবশত তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! তাই আমি বলছিলাম—বুদ্ধি যার বল তারই ইত্যাদি।

বায়সী বলল—সব তো শুনলাম। এখন কী কর্তব্য তা বল।

বায়স বলল—এই নিকটবর্তী সরোবরে রাজপুত্র প্রতিদিন এসে স্নান করেন। স্নানের সময় তার দেহ থেকে স্বর্ণহার খুলে নিয়ে সোপানের শিলার উপরে রাখলে পরে তুমি সেই স্বর্ণহার চঞ্চুতে তুলে নিয়ে এসে এই কোটরে রাখবে।

তারপর একদিন রাজপুত্র স্নানের জন্যে জলে নেমে গেলে বায়সী সেইভাবে কাজ করল। তারপর স্বর্ণহারের সন্ধানে প্রবৃত্ত রাজপুরুষেরা সেই কোটরে এসে কেউটেকে দেখতে পেয়ে তাকে মেরে ফেলল।

তাই আমি বলছিলাম, উপায়ের সাহায্যে যা করা যায়=ইত্যাদি।

করটক বলল—যদি তাই হয় তবে তুমি যাও। তোমার পথ মঙ্গলময় হোক।

তারপর দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল—দেব, সর্বনাশকারী কোন ভয়জনক অমঙ্গল আসন্ন ভেবে আপনার কাছে এসেছি। কারণ—যখন বিপদ আসে, যখন মানুষ সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হয় আর যখন প্রতিবিধানের সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে—সেই সময়েই হিতার্থী যিনি তিনি জিজ্ঞাসিত না হয়েও হিতবাক্য বলেন।

আর একটি কথা—রাজা ভোগ করবেন, কিন্তু কাজের ভার নেবেন মন্ত্রী। যে মন্ত্রী রাজকার্য নষ্ট করেন তিনি সর্বথা নিন্দনীয়। মন্ত্রীদের এই তো কর্তব্য—

প্রাণবিসর্জন অথবা শিরশ্ছেদ—সেও বরং ভালো তবু প্রভুপদপ্রাপ্তির আশায় পাপকর্মে যে উদ্যত তাকে উপেক্ষা করা কিছুতেই সঙ্গত নয়।

পিঙ্গলক সাগ্রহে প্রশ্ন করল—তা তুমি কী বলতে চাও? দমনক বলল—দেব, মনে হচ্ছে সঞ্জীবক আপনার সঙ্গে অসদৃশ ব্যবহারে উদ্যত। আমাদের সামনে সে আপনার তিনশক্তির

নিন্দা করেছে, মনে হচ্ছে সে রাজ্যলাভ করতেই ইচ্ছুক।

এই কথা শুনে পিঙ্গলক সভয়ে এবং সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ নীরব রইল। দমনক পুনরায় বলল—আপনি যে সমস্ত মন্ত্রী ত্যাগ করে একমাত্র ওকেই সর্বাধিকারে নিযুক্ত করেছেন—ভুলটা হয়েছে সেইখানেই। কারণ, মন্ত্রী যখন অত্যন্ত উন্নত হয় তখন রাজলক্ষ্মী তার উপর এবং রাজার উপরে পদভর রেখে দাঁড়ান। কিন্তু স্ত্রীস্বভাববশত অধিককাল ভার বহন করতে না পেরে একজনকে ত্যাগ করেন। আরও একটি কথা—

একজন মন্ত্রীকে যখন রাজা রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব দান করেন মোহবশত দর্প তাকে গ্রাস করে এবং এই দর্পহেতু যে শৈথিল্য আসে তাতেই সে নিজেকে রাজকার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়; বিচ্ছিন্ন হলে স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা তার মনে জেগে ওঠে; এই স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা থেকেই সে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে—সে বিদ্রোহ করে—রাজার প্রাণহানি হওয়ার পূর্বে আর বিরত হয় না। আরও দেখুন—

বিষমিশ্রিত অন্নের, স্খলিত দন্তের এবং দুষ্ট অমাত্যের সমূলে বিনাশই সুখকর।

তাছাড়া—যে রাজা তার রাজলক্ষ্মীর ভার মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে রাখেন তিনি সেই মন্ত্রীর আপৎকালে চালকবিহীন অন্ধের ন্যায় সঙ্কটের সম্মুখীন হন।

সে সব ব্যাপারেই নিজের ইচ্ছামতো চলে। এখন করণীয় বিষয়ে আপনিই প্রভু। আমি এইটুকু জানি—তেমন মানুষ সংসারে নেই যে ঐশ্বর্য কামনা না করে, যে পরের যুবতী ও সুন্দরী ভার্যার দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত না করে।

সিংহ একটু চিন্তা করে বলল—প্রিয় দমনক! পরিস্থিতি যদিও এই রকম, তবু সঞ্জীবকের উপর আমার গভীর স্নেহ। দেখ—

অপরাধ করলেও যে প্রিয় সে প্রিয়ই থাকে। অশেষ দোষে দুষ্ট হলেও এই দেহ কার কাছে না প্রিয়? আরও দেখ—অপ্রিয় কাজ করলেও যে প্রিয় সে প্রিয়ই থাকে। গৃহের সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ করলেও অগ্নির প্রতি কার অনাদর সম্ভব?

দমনক বলল—প্রভু, সেইটেই তো দোষের। কারণ, রাজা যার উপর (অন্যের তুলনায়) অধিক স্নেহদৃষ্টি রাখেন—সে পুত্র হোক, মন্ত্রী হোক বা অপরিচিত কেউ হোক—লক্ষ্মীদেবী তাকেই আশ্রয় করেন। আপনি শুনুন—

অপ্রিয় হলেও যা হিতকর তার পরিণাম সুখকর; বক্তা ও শ্রোতা যেখানে থাকে সেইখানেই সকল সম্পদ বিরাজিত।

আপনি মূল (পুরাতন) ভৃত্যদের ত্যাগ করে এই আগন্তুককে সম্মানিত করেছেন। আপনার এ কাজ অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে। কারণ—

মূল ভৃত্য বর্জন করে অপরিচিতকে সম্মানিত করা উচিত নয়—রাজ্যধ্বংসকারী এর চেয়ে বড় দোষ আর নেই।

সিংহ বলল—কী আশ্চর্য! আমি অভয় দিয়ে এখানে এনে পালন করেছি—সে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে কী করে? দমনক বলল—দেব!

দুর্জনকে নিত্য সেবা করলেও সে তার যথার্থ স্বভাব ফিরে পায়। এ যেন অনেকটা কুকুরের লেজের মতো; স্বেদন (মৃদুতা সম্পাদন), অভ্যঞ্জন (মালিশ প্রভৃতির) প্রভৃতি সত্ত্বেও কুকুরের লেজ যেমন স্বভাব ফিরে পায়।

আরও দেখুন—স্বেদিত, মর্দিত ও রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হলেও মুক্ত হবার বারো বছরের মধ্যে কুকুরের লেজ তার স্বভাবধর্ম ফিরে পায়। আরও একটি কথা—

পোষণ বা সম্মান দুর্জনের প্রীতির কারণ হতে পারে না। অমৃতসিঞ্চন করলেও বিষবৃক্ষে ভোজ্য ফল ফলে না।

তাই আমি বলছি, যার ধ্বংস আমি কামনা করি না তাকে হিতোপদেশ দিতেই হবে। এই হল সজ্জনের ধর্ম, এর বিপরীত হল অসৎলোকের পথ। লোকে বলে—

আমাদের প্রতি তাঁরই স্নেহ আছে যিনি আমাদের অমঙ্গল থেকে নিবৃত্ত করেন। সেই কাজই পবিত্র। তিনিই স্ত্রী, যিনি আজ্ঞার অনুবর্তিনী; সজ্জন যাঁকে সম্মানিত করেন তিনিই প্রাজ্ঞ, তাকেই সম্পদ বলি যা মত্ততা সৃষ্টি করে না; তিনিই সুখী যিনি কামনা থেকে মুক্ত, যিনি অকপট তিনিই বন্ধু, যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরাভূত হন না তিনিই যথার্থ পুরুষ।

সঞ্জীবক থেকে আপনার সংকট উপস্থিত, এ অবস্থায় বিজ্ঞাপিত হয়েও যদি নিবৃত্ত না হন তবে আমার মতো ভৃত্যের কোন অপরাধ হতে পারে না। কারণ—

কামাসক্ত নৃপতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে বা হিত সম্পর্কে উদাসীন হন; নিজের ইচ্ছামতো স্বচ্ছন্দভাবে মত্ত হস্তীর মতো তিনি বিচরণ করেন। কিন্তু যখন অহংকারে উদ্ধত হয়ে তিনি গভীর শোকসাগরে মগ্ন হন, তিনি ভৃত্যকে দোষী ভাবেন, নিজের উদ্ধত আচরণ সম্পর্কে ভাবেন না।

পিঙ্গলক—(স্বগত) পরের মুখে নিন্দা শুনে অন্যের দণ্ডবিধান করা উচিত নয়। নিজে সব তত্ত্ব জেনে স্তুতি বা দণ্ডবিধান করা সঙ্গত।

শাস্ত্রে বলেছে, গুণ দোষ না জেনে অনুগ্রহবর্ষণ বা দণ্ডবিধান বিধি হতে পারে না। এই নীতি নিজের সর্বনাশের জন্যেই অহংকারের বশবর্তী হয়ে সাপের মুখে হাত রাখার মতো। প্রকাশ্যে সে বলল—তাহলে কি সঞ্জীবককে পদচ্যুত করব?

দমনক ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—না না প্রভু, এমন কাজ করবেন না। এতে মন্ত্রভেদের সৃষ্টি হবে। বলেছে—

মন্ত্রবীজ এমন ভাবে গুপ্ত রাখা উচিত যাতে কিছুমাত্র বাইরে প্রকাশিত হতে না পারে, প্রকাশিত হলেও যাতে তার অংকুরোদ্গম না হয়। তবে—

যা গ্রহণ করতে হবে, দিতে বা করতে হবে তা দ্রুত না করলে কাল তার সারবস্তু গ্রাস করে। সুতরাং—

যা আরম্ভ করা হয়েছে তা বিশেষ যত্নে সম্পাদন করতে হবে। কেননা—

মন্ত্রী ভীরু যোদ্ধার মতো, তার সর্বাঙ্গ আবৃত থাকলেও শত্রু কর্তৃক ভেদের আশঙ্কায় অধিককাল স্থির থাকতে পারে না।

এর (সঞ্জীবকের) দোষ আবিষ্কারের পরেও সেই দোষ থেকে তাকে নিবৃত্ত করে সন্ধি করা—সে কাজও খুবই অনুচিত হবে। কেননা—

একবার দোষাবিষ্কারের পর যে মিত্রের সঙ্গে পুনরায় সন্ধি করে সে অশ্বতরীর গর্ভের মতো মৃত্যুকেই আমন্ত্রণ করে।

সিংহ বলল—আগে জেনে নাও, আমাদের কী ক্ষতি সে করতে পারে। দমনক বলল —প্রভু, প্রধান অপ্রধানের সম্পর্ক না জেনে কার কী সামর্থ্য কী করে স্থির করা যাবে। দেখ; সামান্য টিট্টিভীপাখিও সমুদ্রকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।

সিংহ বলল—তার মানে?

দমনক বলতে লাগল—

দক্ষিণসমুদ্রতীরে এক টিট্টিভী দম্পতি বাস করত। সেখানে আসন্নপ্রসবা টিট্টিভী একদিন তার স্বামীকে বলল—নাথ, প্রসবের অনুকূল একটি নিভৃত স্থানের সন্ধান কর। টিট্টিভী বলল—প্রিয়ে, এই স্থানটিই তো প্রসবের যোগ্য। টিট্টিভী বলল—সমুদ্রের জোয়ারে এই স্থান প্লাবিত হয়ে যায়। টিট্টিভী বলল—আমি কি শক্তিহীন যে নিজের গৃহে থাকার অবস্থায় সমুদ্র আমাকে নিগৃহীত করবে? টিট্টিভী হেসে বলল—প্রভু, তোমার ও সমুদ্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য। অথবা—নিজে কোন্ কর্মে যোগ্য বা অযোগ্য—এটি সঠিকভাবে জানা কঠিন—এই জ্ঞান যার আছে সে দুঃখেও অবসন্ন হয় না। তাছাড়া—

অনুচিত কর্ম আরম্ভ করা, স্বজনের বিরোধ, বলবানের বিরুদ্ধে স্পর্ধা এবং স্ত্রীলোকে বিশ্বাস—এই চারটি হল মৃত্যুর দ্বার।

তারপর স্বামীর কথায় সে সেইখানেই প্রসব করল। এই সব শুনে সমুদ্রও তার শক্তি পরীক্ষার জন্যে তার ডিমগুলি নিয়ে গেলেন। শোকার্তা টিট্টিভী তখন স্বামীকে বলল—নাথ, সর্বনাশ হয়েছে, আমার ডিমগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। টিট্টিভী বলল—প্রিয়ে, কোন ভয় নেই।

এই বলে সে পক্ষীদের সম্মেলন ডাকল; তারপর সে পক্ষীদের রাজা গরুড়ের কাছে গেল। সেখানে গরুড়দেবতার কাছে সে সব ঘটনা নিবেদন করল—দেব, আমি নিজের গৃহে ছিলাম। সমুদ্র বিনা অপরাধে আমার উপর পীড়ন করেছেন।

তার কথা শুনে গরুড় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিয়ন্তা ভগবান নারায়ণের কাছে জানালেন। তিনি সমুদ্রকে ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে আদেশ করলেন। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সমুদ্র সেই ডিমগুলি টিট্টিভীকে অর্পণ করলেন।

তাই আমি বলছিলাম—প্রধান ও অপ্রধানের তত্ত্ব না জেনে সামর্থ্য নির্ণয় করা কঠিন।

রাজা বলল—কী করে জানা যাবে সে আমার প্রতি দ্রোহবুদ্ধিসম্পন্ন? দমনক বলল—যখন দেখবেন সে দর্পিত হয়ে, শৃঙ্গের অগ্রভাগের দ্বারা প্রহার করতে উদ্যত হয়ে এবং চকিতভাবে আপনার কাছে আসছে—তখনই প্রভু সব জানতে পারবেন।

এই বলে দমনক সঞ্জীবকের কাছে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সে এমন ভাব দেখাল যেন সে বিস্মিত।

সঞ্জীবক সাগ্রহে প্রশ্ন করল—ভদ্র, তোমার কুশল তো? দমনক বলল ভৃত্যদের আবার কুশল! কেননা—

যারা রাজার আশ্রিত কর্মচারী তাদের সম্পত্তি পরের অধীন, তাদের চিত্ত সকল সময় অশান্ত, জীবন সম্পর্কেও কোন বিশ্বাস নেই। তাছাড়া—

কে অর্থসম্পদ লাভ করে গর্বিত হয় নি? কোন্ বিষয়ী ব্যক্তির দুঃখের অবসান ঘটেছে? এমন কে আছে, যার মন নারী পীড়িত করে নি? কে রাজার প্রিয়? কে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নি? কোন্ প্রার্থী গৌরবলাভ করেছে—আর কে-ই বা দুর্জনের জালে পড়ে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পেয়েছে?

সঞ্জীবক বলল—সখে, তুমি এ সব কী বল?

দমনক বলল—আমি ভাগ্যহীন, কী আর বলব। দেখ—

সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে কোন লোক সর্পের অবলম্বন পেলেও তাকে যেমন গ্রহণও করতে পারে না, ছাড়তেও পারে না—আমি যেন সেই রকমই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। কারণ—

একদিকে রাজবিশ্বাস নষ্ট হতে চলেছে, অন্যদিকে বন্ধু মৃত্যুমুখে। কী করি, কোথায় যাই, আমি যেন দুঃখের সাগরে পড়েছি।

এই বলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসে রইল।

সঞ্জীবক বলল—সখে, আমাকে মনের কথা খুলে বল।

গোপনতার ভান করে দমনক বলল—যদিও গোপনীয় কথা অন্যকে বলা উচিত নয়, তবু তুমি যখন আমাদের উপর বিশ্বাস করে এখানে এসেছ তখন তোমার পক্ষে যা হিতকর, তা তোমাকে নিশ্চয়ই বলব। পরকাল তো আছে। শোন, এই রাজা কোন কারণে তোমার বিরোধী হয়ে উঠেছেন, তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন—সঞ্জীবককে বধ করে স্বজনদের সেই মাংসে তুষ্ট করব।

এই কথা শুনে সঞ্জীবক খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। দমনক তাকে পুনরায় বলল—দুঃখ করে লাভ নেই। সময়মতো যা হয় করতে হবে। সঞ্জীবক একটু ভেবে বলল—তাহলে তো ঠিকই বলা হয়ে থাকে—

নারীগণ দুর্জনের অনুগামিনী হন, রাজা অপাত্রে অর্থ বর্ষণ করেন, অর্থ কৃপণকে অনুসরণ করে আর মেঘ বর্ষণ করে পর্বতে ও সমুদ্রে।

(স্বগত) ব্যাপারটা এরই ষড়যন্ত্র কিনা তা এর ব্যবহার থেকে ঠিক করা কঠিন।

কেননা—কোন কোন অসজ্জনকে আশ্রয়দাতার মহিমাতেই মহিমান্বিত মনে হয়—এ যেন নারীর-চোখে-বিন্যস্ত কালো কাজলের মতো।

হায়, কী বিপদেই না পড়লাম! কারণ—

নৃপতিকে সযত্নে সেবা করলেও তিনি সন্তুষ্ট হন না, এ আর বিচিত্র কী? কিন্তু এটি (বিধাতার সৃষ্টির) এক অপূর্ব রূপ যে সে সেবিত হয়েও শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

এর অর্থ বোঝা কঠিন, অনুমান করে নিতে হয়। কারণ—

কোন কারণে যে অসন্তুষ্ট হয়, কারণ দূরীভূত হলেই সে প্রসন্ন হবে, কিন্তু অকারণে যে বিদ্বেষ পোষণ করে তাকে মানুষ সন্তুষ্ট করবে কেমন করে। আমি রাজার কী অপকার করেছি? অথবা রাজারা অকারণে অনিষ্টাচরণ করে থাকেন।

দমনক মন্তব্য করল—যা বলেছ ঠিক তাই। শোন—

বিজ্ঞ এবং স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিরা যে সদয় কর্ম করেন তা উপেক্ষার যোগ্য হয়ে ওঠে; এদিকে অন্যেরা যথার্থ ক্ষতি করলেও তা হয় প্রজাদের যোগ্য। রাজাদের অব্যবস্থিত মন বুঝে ওঠা কঠিন বলেই—সেবকের সেবাবৃত্তিও কঠিন হয়ে ওঠে—যোগিগণও এই মনের তত্ত্ব বুঝতে পারেন না। তাছাড়া—

অসৎ ব্যক্তির কাছে শত উপকার ব্যর্থ হয়, মূর্খের কাছে শত সুভাষিত অর্থহীন; যারা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে না তাদের কাছে শত উপদেশ ব্যর্থ; অচেতনের কাছে শত হিতকর বাক্যও নিষ্ফল। আরও দেখ—

চন্দনবৃক্ষে সর্প বাস করে, জলে পদ্ম ফোটে, সেখানে নক্রও থাকে, কেউ যখন ভোগে রত তখন তার গুণলোপকারী, দুর্বৃত্তের আবির্ভাব ঘটে—সুতরাং সুখভোগ বিঘ্ন থেকে মুক্ত নয়। আর একটি কথা—

চন্দনবৃক্ষের মূলে সর্প, ফুলে ভ্রমর, শাখায় বানর, শীর্ষে ভল্লুক। সুতরাং চন্দনবৃক্ষের এমন কোন কিছু নেই যেখানে নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রাণীরা আশ্রয় করে নি।

আমি আগেই জেনেছি, আমাদের এই প্রভুর বাক্যে মধু আর হৃদয়ে বিষ। কারণ—

দূর থেকে হাত তুলে সে যখন অভ্যর্থনা জানায়, তখন তার চোখ (আনন্দে) সজল হয়ে ওঠে, অর্ধাসন প্রসারিত করে দেয়, গাঢ় আলিঙ্গনে সে উদ্যত, প্রিয়কথা প্রসঙ্গে আগ্রহ দেখায় ; কিন্তু তার অন্তরে বিষ, বাইরেই সে মধুময়, মায়া সৃষ্টিতে সে অত্যন্ত নিপুণ ; দুর্জনের অভ্যস্ত এই নাটকাভিনয়বিধি সত্যি অপূর্ব।

দুরতিক্রম্য সমুদ্র পার হবার জন্যে নৌকা আছে। অন্ধকারের আবির্ভাবকে বাধা দেবার জন্যে আছে প্রদীপ, যখন বাতাসের অভাব তখন ব্যজন আছে, মদমত্ত হস্তীর দর্প শান্ত করতে আছে অঙ্কুশ ; এই ভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই, বিধাতা যার উপায় চিন্তা করেন নি ; কিন্তু মনে হয়, দুর্জনের চিত্তবৃত্তি-দূরীকরণে বিধাতার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ।

সঞ্জীবক (পুনরায় নিঃশ্বাস ফেলে) হায় কী কষ্ট ! আমি এক শস্যভোজী, শেষে সিংহের বধ্য হলাম ! কারণ —

যাদের সমান বিত্ত, সমান বল তাদের মধ্যে বিরোধের অর্থ বোঝা যায়—কিন্তু উত্তম ও অধমের মধ্যে বিবাদ দুর্বোধ্য।

(পুনরায় চিন্তা করে) কে আমার বিরুদ্ধে রাজার মন বিষাক্ত করেছে, জানি না। বিরোধিতা যখন জেগেছে তখন রাজার ভয়ে থাকতেই হবে। কারণ–

মন্ত্রী থেকে রাজার মন যদি একবার বিচ্ছিন্ন হয় কে তাদের একত্র করবে ? স্ফটিকের বলয় ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। তাছাড়া–

বজ্র ও রাজতেজ–দুই-ই অতি ভীষণ। কিন্তু বজ্র পড়ে একটি স্থানে, অন্যটি চারদিকেই প্রভাব বিস্তার করে।

যুদ্ধে মৃত্যুই আমার পক্ষে বরণীয়। এখন তার আদেশানুবর্তিতা আমার পক্ষে যুক্তিহীন। কারণ–

বীর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভ করে, শত্রুকে নিহত করলে তৃপ্তিলাভ করে। বীরের এই দুইটি গুণ অত্যন্ত দুর্লভ।

এখনই যুদ্ধের উপযুক্ত সময়।

যখন যুদ্ধ ছাড়া মৃত্যু নিশ্চিত, যুদ্ধে জীবনসংশয় (অর্থাৎ জীবনরক্ষা হতেও পারে) তখনই বিজ্ঞের মতে যুদ্ধকাল। কারণ–

যুদ্ধ না করে যদি নিজের কোন মঙ্গল না দেখা যায় তখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন।

জয়ী হলে লক্ষ্মীলাভ, মৃত্যু হলে (স্বর্গে) সুরাঙ্গনা। দেহ যখন মুহূর্তের মধ্যে নাশ পায় তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণে দ্বিধা কোথায় ?

এই ভাবে চিন্তা করে সঞ্জীবক বলল—সে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক—তা কেমন করে বুঝব ?

দমনক বলল—যখন সে লেজ তুলে সামনের থাবা প্রসারিত করে মুখ উন্মুক্ত করে তোমার দিকে তাকাবে তখন তুমিও তোমার শক্তি প্রদর্শন করবে।

কারণ শক্তিমান হয়েও যদি কেউ তেজোহীন হয় তবে সে কার না ঘৃণার পাত্র ?

দেখ, মানুষ নিঃশঙ্ক হয়ে ভস্মস্তূপ পায়ে দলিত করে। কিন্তু এ সবই করতে হবে খুব গোপনে—তা না হলে তোমারও শেষ, আমারও শেষ।

এই বলে দমনক করটকের কাছে গেল।

করটক প্রশ্ন করল—কী হল ?

দমনক বলল—পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছি।

করটক বলল—এ বিষয়ে সন্দেহের আর কী ? কারণ—

দুর্জনের বন্ধু কে ? অত্যন্ত অধিক যাচিত হলে কে ক্রুদ্ধ হয় না ? ধনের গৌরবে কে গর্বিত হয় না ? দুষ্কর্ম সম্পাদনে কে না নিপুণ ? তাছাড়া—

ধূর্তলোক ধনীকে আত্মসমৃদ্ধির জন্যে পাপের পথে চালিত করে। দুর্বৃত্তের সংসর্গ অগ্নির মতোই কোন্ ক্ষতি না করে ?

তারপর দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে বলল—দেব ! সেই পাপিষ্ঠ আসছে। আপনি প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করুন। পূর্বে নির্ধারিত রূপেই তাকে গ্রহণ করাল। সঞ্জীবকও সেখানে এসে সিংহকে পরিবর্তিত বিকৃত রূপে দেখতে পেয়ে নিজের যোগ্য বিক্রম প্রদর্শন করল। তাদের মধ্যে তখন ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। সিংহের বিক্রমে সঞ্জীবক নিহত হল।

পিঙ্গলক সঞ্জীবককে বধ করে বিশ্রামের পর শোকদগ্ধ চিত্তে বসে রইল। সে বলল—আমি কী নিষ্ঠুর কাজ করেছি। কারণ—

যখন রাজা কর্তব্য লঙ্ঘন করেন, তার রাজ্য অপরে ভোগ করে ; হস্তিহননকারী সিংহের মতোই তিনি পাপভাগী হন। তাছাড়া—

যখন রাজ্যের একাংশ নষ্ট হয় অথবা গুণী এবং বুদ্ধিমান সেবকের প্রাণহানি হয়—

সেই ক্ষেত্রে সেবকের ক্ষতিই রাজার কাছে মৃত্যুতুল্য ; নষ্ট ভূমি উদ্ধার করা যেতে পারে—সেবক নয়।

দমনক বলল—প্রভু, এ আবার কোন্ এক নূতন নীতি আপনি গ্রহণ করলেন যে শত্রু বধ করে তার জন্যে আপনি অনুশোচনা করছেন ? শাস্ত্রে বলেছে—

যে রাজা নিজের মঙ্গল কামনা করে তিনি বধোদ্যত শত্রুকে হত্যা করবেন সেই শত্রু তার পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বা বন্ধু যে-ই হোক না কেন। তাছাড়া—

যিনি ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন তার পক্ষে একান্ত দয়ালু হওয়া অনুচিত। ক্ষমাবৃত্তির অধীন হলে তিনি হস্তস্থিত বস্তুকেও রক্ষা করতে পারেন না। আরও দেখুন—

বন্ধু বা শত্রুকে ক্ষমা করা—সে তো মুনিদের অলংকার। কিন্তু সেই গুণই যদি রাজা অপরাধীদের প্রতি প্রদর্শন করেন তা দোষে পরিণত হয়। আর একটি কথা—

রাজ্যলোভে বা অহংকারের বশবর্তী হয়ে যে প্রভুর পদ কামনা করবে—প্রাণত্যাগই তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, অন্য কিছুই নয়। আর একটি কথাও ভেবে দেখুন—

দয়াবান রাজা, সর্বভূক ব্রাহ্মণ, অবশীভূতা ভার্যা, দুঃপ্রবৃত্তি সঙ্গী, উদ্ধত ভৃত্য, উদাসীন কর্মচারী—এ সকলই পরিত্যাজ্য ; তা ছাড়া এর সঙ্গে আছে অকৃতজ্ঞ পুরুষ।

বিশেষত—কখনও সত্য কখনও বা মিথ্যার সেবক, কখনও কঠোর কখনও মধুর ভাষা, নির্দয় অথচ ক্ষমাশীল, কখনও সঞ্চয়ী কখনও বা বদান্য সদাব্যয়ী—কিন্তু প্রচুর অর্থ ও রত্নজয়ী,—রাজনীতি গণিকার মতোই বহুরূপিণী।

এই ভাবে দমনক পিঙ্গলককে আশ্বস্ত করল। পিঙ্গলক প্রকৃতিস্থ হল। সে সিংহাসনে উপবেশন করল। দমনক 'মহারাজ বিজয়ী হোন, সর্ব জগতের কল্যাণ হোক'—এই বলে সুখে বাস করতে লাগল।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—'সুহৃদ্ভেদ' তোমরা শুনলে।

রাজপুত্রেরা বলল—আপনার অনুগ্রহে শুনতে পেলাম। আমরা সুখী হয়েছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—তাহলে—এ-ও হোক।

বন্ধু বিচ্ছেদ তোমাদের শত্রুর গৃহে হোক। দুর্বৃত্তগণ মৃত্যুরাজের আকর্ষণে প্রতিদিন ধ্বংস হোক। প্রজাগণ সর্ববিধ সুখ ও সমৃদ্ধির উৎস হোক, বালকগণ কাহিনীর উদ্যানে ক্রীড়া করুক।

বিগ্রহ

আবার যখন কাহিনী শুরু করতে যাবেন এমন সময় রাজপুত্রেরা বলল, আর্য, আমরা রাজপুত্র; তাই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু শুনতে আমাদের কৌতূহল হচ্ছে। বিষ্ণুশর্মা বললেন–নিশ্চয়ই, তোমাদের যেমন রুচি তেমন কথাই শোনাব। যা শোনাব তার প্রথম শ্লোকটির মর্মার্থ হল এই :–

হংসের সঙ্গে ময়ূরদের একবার যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে দুই পক্ষই সমান বিক্রম দেখিয়েছিল। পরে শত্রুর শিবিরে বাস করত যে-সব কাক তাদের দ্বারা হংসের দল প্রতারিত হয়েছিল।

রাজপুত্রেরা বলল–সে আবার কী?

বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন–

কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে একটি সরোবর ছিল–সেখানে থাকত এক রাজহংস–নাম হিরণ্যগর্ভ। জলচর পক্ষীরা সবাই মিলে তাকে পক্ষীরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করেছিল। কেননা, প্রজাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে যদি কোন রাজা না থাকে তবে প্রজারা সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন নৌকার মতো দুঃখের সংসারে ভাসতে থাকে।

রাজা প্রজাদের রক্ষা করেন, প্রজাপুঞ্জ সমৃদ্ধ করে রাজাকে। রক্ষণ সমৃদ্ধির চেয়ে বড়–রক্ষণ যদি না থাকে তবে যা আছে তা-ও না থাকার মতোই।

একদিন এই রাজহংস তার বিস্তীর্ণ পদ্মশয্যায় বসে ছিল–তাকে ঘিরে ছিল তার অনুচরের দল। এমন সময় কোন এক দেশ থেকে দীর্ঘমুখ নামক এক বক এসে তাকে প্রণাম করে বসল। রাজা বললেন–দীর্ঘমুখ, তুমি তো বিদেশ থেকে এলে, এখন খবর বল। দীর্ঘমুখ বলল–মহারাজ, একটি বড় খবর আছে, সেটি আপনাকে বলবার জন্যে দ্রুত চলে এসেছি। শুনুন–

জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামে এক পর্বত আছে। এক ময়ূর সেখানে থাকে–নাম চিত্রবর্ণ, সে পক্ষীদের রাজা। একদিন আমি দগ্ধারণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় তার কয়েকটি অনুচরের সঙ্গে আমার দেখা। তারা আমাকে দেখে কাছে এসে বলল–তুমি কে? কোথা থেকে এলে? আমি বললাম–আমি কর্পূরদ্বীপের রাজচক্রবর্তী হিরণ্যগর্ভের অনুচর, কৌতূহলবশত অন্য দেশ দেখতে এসেছি। আমার কথা শুনে পক্ষীরা বলল–এই দুটি দেশ এবং রাজার মধ্যে কোন্‌টি তোমার কাছে বেশি ভালো মনে হয়? আমি উত্তর দিলাম–আঃ, এ কথা কেন বলছ? দুই দেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কারণ কর্পূরদ্বীপ স্বর্গতুল্য–আর রাজহংস দ্বিতীয় স্বর্গপতি। তোমরা কিসের জন্যে এই মরুদেশে পড়ে আছ? এসো, আমাদের দেশে এসো। আমার কথা শুনে তারা খুব রেগে গেল। শাস্ত্রে আছে–সাপকে দুগ্ধ পান করাও, তাতে তার বিষ বাড়বে। মূর্খকে উপদেশ দিলে তাতে তার ক্রোধ বাড়বে। তাছাড়া–

বিদ্বানকেই উপদেশ দেওয়া উচিত, অশিক্ষিতকে কখনও নয়, কারণ, বানরদের উপদেশ দিতে গিয়ে আশ্রয় হারিয়ে পাখিদের চলে যেতে হয়েছিল।

রাজা বললেন–সে আবার কী?

দীর্ঘমুখ বলতে লাগল–

কথা ॥ এক

নর্মদা নদীর তীরে পর্বতের উপত্যকায় এক বিশাল শাল্মলী গাছ—সেখানে বাসা তৈরি করে পাখিরা বর্ষাতেও সুখে বাস করত। একদিন বর্ষাকালে আকাশ জুড়ে এলো মেঘ, মনে হল যেন কালো-নীলের এক আচ্ছাদন ; তারপর এলো প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টি। পাখিরা দেখল—তরুতল থেকে বানরের দল শীতে ক্লিষ্ট হয়ে কাঁপছে—তাদের দয়া হল. তারা বলল—কেবলমাত্র চঞ্চুর সাহায্যে তৃণ সংগ্রহ করে আমরা বাসা তৈরি করেছি। তোমাদের হাত-পা আছে, তবু কেন কষ্ট পাচ্ছ ?

এ কথা শুনে বানরদের রাগ হল। তারা আলোচনা করতে লাগল—হায়, পাখিরা এমন বাসা তৈরি করেছে. যেখানে লেশমাত্র বায়ু প্রবেশ করতে পারে না ; আর সেই বাসায় থেকে সুখী পাখিরা আমাদের নিন্দা করছে। আচ্ছা. বৃষ্টিটা থামুক, দেখা যাবে।

তারপর বর্ষণ যখন থামল—সেই বানরেরা গাছে উঠে বাসাগুলি ভেঙে দিল—আর তাদের ডিমগুলিও নীচে ছুড়ে ফেলল।

তাই আমি বলছিলাম—বিদ্বানকেই উপদেশ দেওয়া উচিত।

রাজা বললেন—তারপর তারা, ময়ূরের অনুচরেরা কী করল ?

বক বলল—তখন সেই পাখিরা রেগে গিয়ে বলল—ঐ রাজহংসকে কে রাজা করেছে ?

শুনে আমার খুব রাগ হল, আমি বললাম—তোমাদের ময়ূরকে কে রাজা করেছে ?

আমার এই কথা শোনার পর তারা সবাই মিলে আমাকে বধ করতে এলো ; আমিও নিজের বিক্রম দেখালাম, কেননা, স্ত্রীলোকের যেমন লজ্জা, তেমনি ক্ষমাও পুরুষের ভূষণ, কিন্তু সে অন্য সময়ে ; তখন, যেমন অপমানিত হলে শৌর্যই পুরুষের অলংকার—রতিক্রিয়ায় প্রগল্‌ভতাই নারীর ভূষণ (তখন লজ্জা করলে চলে না)।

রাজা হেসে বললেন—যে নিজের এবং শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা বিচার করেও পার্থক্য বুঝতে পারে না, শত্রুরা তাকে পরাভূত করে। আরও দেখ—

দীর্ঘকাল অন্যের শস্যক্ষেত্রে শস্যভক্ষণ করে কাটাবার পর এক নির্বোধ গর্দভ তার কর্কশ কণ্ঠের জন্যেই মৃত্যু বরণ করেছিল।

বক প্রশ্ন করল—সে আবার কী ?

রাজা বললেন—

কথা ॥ দুই

হস্তিনাপুরে বিলাস নামে এক রজক ছিল। তার গর্দভটি অত্যধিক ভার বহন করতে করতে দুর্বল ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। তখন সেই রজক তাকে ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত করে বনের কাছে একটি শস্যক্ষেত্রে রেখে এলো। দূর থেকে তাকে দেখে ক্ষেত্রপতিরা তাকে বাঘ মনে করে দ্রুত পালিয়ে যেত। শেষে একদিন একজন শস্যরক্ষক ধূসর কম্বল দিয়ে গা ঢেকে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে একটি কোণে অপেক্ষা করতে লাগল।

গর্দভ তখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট—ইচ্ছামতো শস্যভক্ষণ করে শক্তিও সঞ্চয় করল ; সে দূর থেকে তাকে দেখে মনে করল, এক গর্দভী বুঝি! (আনন্দে) চিৎকার করে

সে তার কাছে ছুটে এলো। তখন সেই শস্যরক্ষক তার কণ্ঠস্বর শুনে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল—এটি এক গর্দভ; তখন সে সহজেই তাকে বধ করল। তাই বলছিলাম—দীর্ঘকাল অন্যের শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করে—

সে যা হোক, তারপর কী হল?

তখন দীর্ঘমুখ বলল—তারপর সেই পাখিরা বলল—ওরে পাপিষ্ঠ দুষ্ট বক! তুমি আমাদের দেশে থেকে আমাদের প্রভুকে নিন্দা করবে—এখন থেকে তা সহ্য করা হবে না। এই বলে তারা চঞ্চু দিয়ে আঘাত করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—দেখ মূর্খ! তোমার রাজা সেই হংস সব রকমেই দুর্বল—হস্তগত কোন বস্তুকেও সে রক্ষা করতে অক্ষম। সে পৃথিবী কী করে শাসন করে? রাজ্য দিয়েই বা তার কী হবে? তুমি কূপের মণ্ডুক, তাই তার আশ্রয় নেবার কথা বলছ। শোন—

মহাবৃক্ষকেই সেবা করা উচিত, কেননা সেখানে ফল আছে, ছায়া আছে; দৈবক্রমে যদি ফল না-ও জোটে ছায়াকে বাধা দেবে কে?

আরও দেখ, হীনের সেবা করা অনুচিত, মহতের আশ্রয় গ্রহণই কর্তব্য। সামান্য দুধও সুরাবিক্রয়কারিণীর হাতে সুরার মর্যাদা লাভ করে।

আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার সম্পর্কবশত গুণের সমষ্টিও তুচ্ছ হয়ে যায়, নির্গুণও বিশিষ্টতা পায়। তাছাড়া—

যখন রাজা অত্যন্ত শক্তিমান তখন কপট উপায়ের সাহায্যেও কার্যসিদ্ধি ঘটে; 'আমরা চন্দ্রের অনুচর' এই মিথ্যা পরিচয়েও শশকেরা সুখে বাস করেছিল।

আমি বললাম—সে আবার কী?

পাখিরা বলতে লাগল—

কথা ॥ তিন

একবার বর্ষাকালেও বর্ষণের অভাবে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত একদল হাতি তাদের দলপতিকে বলল—প্রভু, আমাদের জীবনরক্ষার উপায় কী? এখানে ক্ষুদ্র প্রাণীদের স্নানের ব্যবস্থা আছে—আমরা স্নানের অভাবে মৃতপ্রায়! কোথায় যাব, কী করব?

তখন হস্তীরাজ কিছু দূরে গিয়ে একটি নির্মল হ্রদ দেখিয়ে দিলেন। তারপর দিন যেতে লাগল; আর সেই হ্রদের তীরবাসী ক্ষুদ্র শশকের দল হাতির পায়ের চাপে নিষ্পিষ্ট হতে লাগল। তখন শিলীমুখ নামক শশক ভাবল—পিপাসার্ত হয়ে এই হাতির দল প্রত্যহ এখানে আসবে, এইভাবে আমাদের বংশ লোপ পাবে। সেই সময় বিজয় নামে এক বৃদ্ধ শশক বলল—দুঃখ কোরো না, আমি এর প্রতিকার করব। এইভাবে প্রতিকারের কথা দিয়ে সে চলতে লাগল। যেতে যেতে সে ভাবল—

হাতি স্পর্শমাত্রই বধ করে, ঘ্রাণ নেওয়া মাত্রই সর্প হনন করে, মুখে হাসি রেখেই রাজা হনন করেন, বাইরে সম্মান দেখিয়ে দুর্জনেরা বধ করে।

সুতরাং আমি পর্বতশিখরে উঠে যূথপতির সঙ্গে কথা বলব। সে তা-ই করল।

তখন যূথপতি প্রশ্ন করল—কে তুমি?

সে বলল—আমি এক শশক। ভগবান চন্দ্রদেব আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

যূথপতি জবাব দিল কী কাজে এসেছ বল।

বিজয় বলল—সামনে উদ্যত অস্ত্র দেখেও দূত সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলে না। তার চরিত্র বিশুদ্ধ বলেই সে যা সত্য তা-ই বলে।

আমার প্রভুর আদেশেই আমি বলছি—শোন। চন্দ্র সরোবরের রক্ষক এই সব শশককে যে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ এটি গুরুতর অন্যায়। কারণ শশক আমার আশ্রিত—তাই আমার নাম শশাঙ্ক।

দূত এই কথা বলার পর যূথপতি সভয়ে বলল, না জেনে করে ফেলেছি—আর ওখানে যাব না।

দূত বলল—তাই যদি হয়ে থাকে, তবে এই সরোবরে এসো, দেখ তিনি ক্রোধে কাঁপছেন—তাঁকে প্রণাম করে, প্রসন্ন করে যাও। তারপর সে রাত্রিতে যূথপতিকে নিয়ে গিয়ে সরোবরের জলতরঙ্গে কম্পমান চন্দ্রবিম্বকে দেখিয়ে দিল।

যূথপতি প্রণাম করল। যূথপতি বলল-দেব, আমি না জেনে অপরাধ করেছি—তাই ক্ষমা করুন। এমন কাজ দ্বিতীয় বার আর করব না। এই বলে সে চলে গেল। তাই আমি বলছিলাম কপটতার আশ্রয়েও সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে।

তখন আমি (দীর্ঘমুখ) বললাম-আমার প্রভু মহাপ্রতাপশালী, অত্যন্ত সমর্থ। তিনি ত্রিলোকের প্রভুত্ব লাভের যোগ্য, ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা কী বলব।

তখন সেই পাখিরা বলে উঠল-ওহে দুর্বৃত্ত! তবে আমাদের দেশে মরতে এসেছ কেন?-এই বলে আমাকে নিয়ে গেল রাজা চিত্রবর্ণের কাছে। রাজার সামনে আমাকে দেখিয়ে ওরা বলল-দেব! শুনুন, এই দুষ্ট বক আমাদের দেশে বিচরণ করে আপনার নিন্দা করছে। রাজা বললেন-এ কে? কোথা থেকে এসেছে? তারা বলল-এ হিরণ্যগর্ভ থেকে এসেছে। তার মন্ত্রী এক গৃধ্র আমাকে প্রশ্ন করলেন-ওখানে মুখ্য মন্ত্রী কে?

আমি উত্তর দিলাম—সর্বশাস্ত্রবিশারদ সর্বজ্ঞ নামক এক চক্রবাক। গৃধ্র উত্তর দিলেন-ঠিকই হয়েছে, চক্রবাক ঐ দেশেরই অধিবাসী। কেননা, রাজা তাকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করবেন—যিনি সেই দেশবাসী, সদাচারসম্পন্ন, দোষরহিত, যার রাজভক্তি পরীক্ষিত, যিনি মন্ত্রজ্ঞ এবং বিলাসে অনাসক্ত, ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ, খ্যাতিমান, সদ্বংশজাত, বুদ্ধিমান এবং যিনি রাজ্যের অর্থভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম।

শুক পাখি উঠে বলল-দেব, কর্পূরদ্বীপ এবং এই রকম আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ জম্বুদ্বীপেরই অন্তর্গত। সেই সব স্থানের আধিপত্য আপনারই।

রাজাও বললেন-সত্য কথা, তোমার কথাই ঠিক। কেননা—

রাজা, উন্মত্ত, শিশু, যুবতী এবং ধনগর্বিত ব্যক্তি-যা অপ্রাপ্য তাই পেতে চায়-প্রাপ্য বস্তু পেতে চাইবে তাতে আর বিচিত্র কী?

এর পর আমি বললাম-যদি বাক্যের বলেই প্রভুত্ব স্থাপিত হয় তবে আমার প্রভু হিরণ্যগর্ভ জম্বুদ্বীপেরও অধিপতি।

শুক বলল-এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে কী উপায়ে?

আমি জবাব দিলুম-যুদ্ধই একমাত্র পথ।

রাজা হেসে বললেন-তাহলে যাও, তোমার রাজাকে গিয়ে বল প্রস্তুত হতে।

আমি বললাম-আপনিও আপনার দূত পাঠান।

রাজা তার অনুচরদের দিকে তাকিয়ে বললেন-তোমাদের মধ্যে কে যাবে? দূতকে

হতে হবে ব্রাহ্মণ, সৎ, নিপুণ, পরিশ্রমী, সাহসী, পাপে অনাসক্ত, ক্ষমাশীল, শত্রুর দুর্বলতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন।

গৃধ্র বলল–দূত তো অনেকই আছে, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকেই নির্বাচন করুন। কারণ–তিনি তার প্রভুকেই সন্তুষ্ট করবেন, নিজের সম্পদ কামনা করবেন না। কালকূট বিষের কালিমা শিবের সংসর্গেও মুছে যায় না।

রাজা বললেন–তবে শুকই যাক। শুকের দিকে তাকিয়ে বললেন–তুমি এর সঙ্গে গিয়ে আমাদের অভিলাষ জানাও। শুক বলল–আপনার যেমন আদেশ। কিন্তু এই বক দুর্জন–তাই এর সঙ্গে যাব না।

এ রকম বলা হয়ে থাকে–খল ব্যক্তি দুষ্কর্ম করে, সাধু ব্যক্তিদের তার ফলভাগী হতে হয়। রাবণ সীতাকে অপহরণ করলেন, বন্ধন হল সাগরের। তাছাড়া–

দুর্জনের সঙ্গে কোনক্রমেই থাকা উচিত নয়, কাকের সঙ্গে থেকে হংস হত হল–কাকের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে এক চড়াই পাখিরও জীবন শেষ।

রাজা বললেন–ব্যাপারটা কী হয়েছিল?

শুক বলতে লাগল–

কথা ॥ চার

উজ্জয়িনী যাবার পথে পাশেই প্রান্তরে ছিল এক পিপ্পল গাছ। সেখানে থাকত হাঁস ও কাক। কোন এক গ্রীষ্মকালে পথশ্রান্ত এক পথিক সেই তরুতলে ধনু আর তীর রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার মুখের উপর থেকে গাছের ছায়া সরে গেল। সূর্যের আলো তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে দেখে সেই বৃক্ষবাসী হংস দয়াপরবশ হয়ে পক্ষ প্রসারিত করে ছায়া করে দিল। এই সময় নিশ্চিন্ত নিদ্রার সুখে সেই পথিক মুখব্যাদান করল–আর পরসুখে অসহিষ্ণু কাক স্বাভাবিক দুষ্টবুদ্ধি হেতু তার মুখে মলত্যাগ করে পলায়ন করল। পথিক (ঘুম থেকে জেগে উঠে) যখন উপরের দিকে তাকাল সে দেখতে পেল হাঁসকে–সে তখন তীর ছুড়ে তাকে হত্যা করল। তাই বলছিলাম দুর্জনের সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

ভারুই পাখির কাহিনীও বলছি।

কথা ॥ পাঁচ

একবার পাখিরা মিলে ভগবান গরুড়ের উৎসব উপলক্ষ্যে সমুদ্রতীরে গিয়েছিল–এক কাক ও এক ভারুই পাখিও যাচ্ছিল। যাত্রীদের সঙ্গে ছিল এক গোপাল–তার মাথায় ছিল দধিভাণ্ড। কাক সেই দধিভাণ্ড থেকে বার বার খেতে খেতে যাচ্ছিল গোপাল সেই দধিভাণ্ড মাটিতে রেখে উপরের দিকে তাকাল–দেখল সেই কাক আর ভারুইপাখিকে। সে খেদিয়ে দিতেই কাক পালিয়ে গেল। ভারুই পাখির মন্দ গতি; সে পালাতে পারল না। গোপাল তাকে পেয়ে বধ করল।

তাই আমি বলছিলাম–দুর্জনের সঙ্গে থাকাও উচিত নয়। কোথাও যাওয়াও উচিত

নয়। তখন আমি বললাম—ভাই শুক, এমন কথা বলছ কেন? আমি মহারাজকে যেমন শ্রদ্ধা করি, তোমাকেও তেমনি করি। শুক বলল—হয়তো তাই। কিন্তু—দুর্জনের দ্বারা উচ্চারিত প্রিয় কথা যদি হাসিমাখাও হয়—তবু তা ভয় সৃষ্টি করে, যেমন ভয়ের কারণ হয় অকালে-ফোটা ফুল।

তোমার বাক্যেই বোঝা গেছে তুমি দুর্জন, কেননা তোমার বাক্য বলেই এই দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ হতে চলেছে। দেখ—

মূর্খের চোখের সামনে অপরাধ করলেই তাকে মধুর ভাষণের দ্বারা তুষ্ট করা যেতে পারে। রথনির্মাতাও তার স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রেমিককে নিজের কাঁধে বহন করেছিল।

রাজা বললেন—সে আবার কী? শুক বলতে লাগল।

কথা ॥ ছয়

যৌবনশ্রী নগরে এক রথনির্মাতা বাস করত। সে জানত যে তার স্ত্রী কুলটা। কিন্তু সে স্ত্রীকে তার উপপতির সঙ্গে এক স্থানে দেখতে পেত না। একদিন রথকার বলল, আমি অন্য গ্রামে যাচ্ছি। এই বলে সে যাত্রা করল। কিছুদূর গিয়ে গোপনে নিজের গৃহে ফিরে এসে খাটের নীচে লুকিয়ে রইল।

রথনির্মাতা অন্য গ্রামে গিয়েছে এই বিশ্বাসে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে স্ত্রী তার প্রেমিককে সন্ধ্যাকালেই ডেকে পাঠাল। তারপর সে সুখে তার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মত্ত হল—হঠাৎ খাটের নীচে প্রতীক্ষমান স্বামীর সঙ্গে তার অঙ্গের স্পর্শ ঘটল—সে বুঝতে পারল—তার স্বামী; আর স্বামী আছে জেনে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

তখন উপপতি বলল—আজ তুমি আমার সঙ্গে তেমন মন দিয়ে রমণ করছ না কেন? তোমাকে যেন বিহ্বলের মতো দেখাচ্ছে। তখন সে বলল—তুমি কিছুই জানো না। যিনি আমার প্রাণেশ্বর; যার সঙ্গে আমার কুমারী অবস্থা থেকেই বন্ধুত্ব, তিনি আজ অন্য গ্রামে গিয়েছেন। তিনি নেই বলে জনপূর্ণ এই গ্রাম আমার কাছে অরণ্যের মতো মনে হচ্ছে। সেই অপরিচিত স্থানে তার কী হয়েছে, তিনি কী খেয়েছেন কেমন বিছানায় শুয়েছেন—এমনি নানান্ ভাবনায় আমার মন অস্থির।

উপপতি বলল—তাই নাকি। সেই রথকার তোমার এমনি প্রেমপাত্র?

সেই কুলটা বলল—ওহে বর্বর! কী বলছ তুমি? শোন—

যে নারী, স্বামী কঠোর বাক্য প্রয়োগ করলে কিংবা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেও তাকে প্রফুল্ল মুখে অভ্যর্থনা করে—সেই নারী ধর্মের আশ্রয়।

স্বামী নগরবাসী হোক বা বনবাসী হোক যে-সব নারী তাদের স্বামীকে ভালোবাসে, মহান সুখলোকগুলি তো তাদের জন্যেই সঞ্চিত রয়েছে। তাছাড়া—

নারী অলংকারবিহীনা হোক—স্বামীই তার শ্রেষ্ঠ অলংকার; কেননা স্বামীকে বাদ দিয়ে সুসজ্জিতা নারীও লাবণ্যহীনা।

তুমি জার ছাড়া আর কিছুই নও। মনের চাঞ্চল্য হেতু কখনও কখনও তোমার প্রয়োজন বোধ করি—পুষ্পলতা, তাম্বুল—এ সবও তো মাঝে মাঝে দরকার হয়। কিন্তু তিনি আমার প্রভু—তিনি আমাকে বিক্রয় করতে পারেন, দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দান করতেও পারেন। আসল কথা, তিনি বাঁচলেই আমি বাঁচি, তার মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে আমারও মৃত্যু। এই

আমার সংকল্প। কেননা মানুষের দেহে কেশের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। স্বামীর মৃত্যুর পরে যে তার অনুগমন করে সে ততো বৎসরই স্বর্গে বাস করে।

আরও একটি কথা—ওঝা যেমন নিজের শক্তিতে কোন সর্প বিল থেকে তুলে নিয়ে আসে তেমনি নারীও তার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় স্বর্গলোকে—সেইখানেই সে অভ্যর্থিত হয়।

যে নারী তার মৃত স্বামীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে একই চিতায় দেহ ত্যাগ করে সে শত শত পাপ করলেও স্বামী নিয়ে স্বর্গে যায়।

এই সব কথা শুনে সেই রথনির্মাতা বলল—ধন্য আমি, যার এই রকম প্রিয়বাদিনী, পতির অনুরাগিণী ভার্যা। এই সব ভাবনা যখন মনে এলো—তখন সে সেই খাটটি মাথায় তুলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল—খাটের উপরে ছিল তার স্ত্রী ও তার জার!

তাই আমি বলছিলাম—মূর্খের চোখের সামনে অপরাধ করলেও--ইত্যাদি।

তখন রাজা আমাকে যথারীতি স্তুতি করে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। সেই শুক পাখিও আমার পিছনে আসছে। এই সব শুনে আপনি যা করা প্রয়োজন স্থির করুন।

চক্রবাক হেসে মন্তব্য করল—দেব। এই বক অন্য দেশে গিয়েও তার সাধ্যমতো রাজকার্য করেছে; কিন্তু এটি মূর্খদের স্বভাব। কেননা—

শত মুদ্রা ব্যয় করতে হয় তাও ভালো, তবু কলহ করা অন্যায়--এই হল বিজ্ঞদের অভিমত; কিন্তু কোন কারণ ছাড়া বিরোধ মূর্খের লক্ষণ।

রাজা বললেন—অতীতের আলোচনায় কী লাভ? সামনে যা উপস্থিত হয়েছে সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়াই ভালো। চক্রবাক বলল--দেব, আমি নিভৃতে কথা বলতে চাই।

কারণ, বিজ্ঞ ব্যক্তি অপরের বর্ণ, আকৃতি ও শব্দধ্বনি দ্বারা তার মনোগত ভাবনার কথা অনুমান করতে পারেন। সুতরাং নির্জনে আলোচনা করাই উচিত।

রাজা আর মন্ত্রী সেখানে রইলেন—অন্য সবাই অন্যত্র চলে গেলেন। চক্রবাক বলল—দেব, আমার ধারণা এই যে আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে কারও প্ররোচনায় বক এই কাজ করেছে। কারণ রোগীরাই চিকিৎসকের মনোমতো, রাজকর্মচারীদের প্রিয় খলব্যক্তি। বিজ্ঞদের লাভের কারণ হয় মূর্খেরা, সদ্বংশীয়গণ সজ্জনের জীবনস্বরূপ।

রাজা বললেন—সে যা-ই হোক। কারণের সন্ধান পরে করা যাবে। এখন আমাদের করণীয় কী তা ই স্থির করতে হবে। চক্রবাক বলল—দেব, প্রথমে আমাদের গুপ্তচর সেখানে চলে যাক--সেখানে গিয়ে জেনে আসুক তাদের কর্মধারা কী, তাহলে আমরা জানতে পারব তাদের শক্তি বা দুর্বলতা কোথায়। কারণ--

নিজের রাজ্য বা শত্রুরাজ্য বিষয়ে কী করতে হবে তা স্থির করতে হলে রাজার চক্ষু হবে গুপ্তচরগণ। যার সেই চক্ষু নেই সে অন্ধ।

সুতরাং দ্বিতীয় একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাক। সেখানে থেকে সে গোপনে জেনে নেবে শত্রুপক্ষ কোন্ গোপনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে, তারপর সেই সব তথ্য দূতকে বলে এখানে পাঠিয়ে দেবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

তপস্বীর ছদ্মবেশে কোন পবিত্র স্থানে, মন্দিরে অথবা আশ্রমে সমবেত গুপ্তচরের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজা পরামর্শ করবেন--বাইরের উদ্দেশ্য থাকবে শাস্ত্রের সত্যকে জানা।

যে জলে এবং স্থলে বিচরণ করতে পারে সে-ই গুপ্তচর হবার যোগ্য। সুতরাং এই রকমই কাউকে নিযুক্ত করুন। এই ধরনের অন্য কোন বক সঙ্গী হিসাবে তার সঙ্গে যাবে।

তাদের পরিবারের লোকেরা রাজদ্বারে অপেক্ষা করুক। কিন্তু প্রভু, কঠোরতম গোপনীয়তা রক্ষা করে এই কাজ করতে হবে। কারণ–

কোন পরামর্শ যদি ছয়টি কান শোনে (অর্থাৎ যদি তৃতীয় লোকের কর্ণগোচর হয়) তবে তা বহুজনে শোনার মতোই। সুতরাং নিজেকে দ্বিতীয়রূপে রেখে (অর্থাৎ মন্ত্রীর সঙ্গে) রাজার মন্ত্রণা করা উচিত।

রাজার মন্ত্রণা বাইরে প্রকাশিত হয়ে গেলে রাজার যে অশুভ দেখা দেয়–নীতিবিৎ পন্ডিতদের অভিমত–তার প্রতিবিধান করা যায় না।

রাজা একটু ভেবে বললেন–শ্রেষ্ঠ চর আমি পেয়েছি। মন্ত্রী বলল–তাহলে সংগ্রামে বিজয়লাভও আপনার।

ঠিক এই সময়ে দ্বাররক্ষক এসে প্রণাম করে বলল–দেব। জম্বুদ্বীপ থেকে এক শুক এসে দ্বারে অপেক্ষা করছে।

রাজা চক্রবাকের দিকে তাকালেন ; চক্রবাক বলল–দূতের জন্যে যে বাসস্থান নির্মিত হয়েছে–সে সেইখানে গিয়ে বিশ্রাম করুক। আমরা পরে তাকে ডেকে পাঠাব, রাজার সঙ্গেও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেব। দ্বাররক্ষক শুককে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট বাসস্থানে চলে গেল।

রাজা বললেন–মনে হচ্ছে যুদ্ধ দ্বারদেশে। চক্রবাক বলল–তবুও আমার মনে হয় যুদ্ধের পথে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ–

সে কি বিচক্ষণ মন্ত্রী যে সুষ্ঠুভাবে বিচার না করেই রাজাকে প্রথমেই যুদ্ধের জন্যে উদ্যোগী হতে অথবা স্বদেশ ত্যাগের পরামর্শ দেয় ?

শত্রুকে পরাজিত করার চেষ্টা নিশ্চয়ই সঙ্গত, কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা কখনও নয় ; কারণ, যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে কে জয়ী হবে তা অনিশ্চিত।

শত্রুকে নত করতে হবে শান্তিবচনে, দানে অথবা বিভেদ সৃষ্টি করে–এই উপায় ক'টি একসঙ্গে অথবা পৃথক প্রয়োগ করে–যুদ্ধের মাধ্যমে কখনো নয়। কারণ–

যতক্ষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়েছে ততক্ষণ প্রত্যেক মানুষই বীর। শত্রুর সামর্থ্য না জানা পর্যন্ত কে না দর্প প্রকাশ করে থাকে ?

তাছাড়া, উত্তোলনদন্ডের সাহায্যে একটি বৃহৎ প্রস্তরখন্ড সহজেই তুলতে পারা যায়, তেমনি সামান্য উপায়ে মহৎ সিদ্ধি–মন্ত্রণার ফলই হল তাই।

কিন্তু যুদ্ধ আসন্ন দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেই হবে। কেননা–

যথাকালে উদ্যোগী হলে যেমন কৃষিকাজ সফল হয়ে থাকে, তেমনি মন্ত্রণায় নীতিও যথাসময়ে সুফল প্রসব করে–অল্পকালের মধ্যে কিছুই হয় না। আর একটি কথা–

বিপদ যখন দূরে থাকে তখন উদ্বেগ বোধ করা আর যখন আসন্ন হয় তখন বীরের মতো তার সম্মুখীন হওয়া–এই হল মহতের গুণ। যিনি মহান তিনি বিপদ এলে ধীরতা অবলম্বন করেন। আরও দেখুন–

সর্বপ্রকার সিদ্ধি বিষয়ে মনের চঞ্চলতাই সবচেয়ে বড় বাধা। জল, যত শীতলই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত পাহাড় ভেদ করে।

মহারাজ, বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে–এই চিত্রবর্ণ অত্যন্ত শক্তিশালী।

বলবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে নীতিশাস্ত্রের এমন কোন নির্দেশ নেই। হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে মানুষের মরণ হবেই। তাছাড়া–

সুযোগ না আসতেই যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় সে মূর্খ। বলবানের সঙ্গে বিরোধ আর পিপীলিকার পাখা গজানো- একই কথা। আরও ভেবে দেখুন—

কূর্ম যেমন দেহ গুটিয়ে নেয় সেই নীতি অবলম্বন করে শত্রুর প্রহারও সহ্য করে যেতে হবে; পরে উপযুক্ত সময় এলে গর্জে উঠতে হবে ক্রূর সর্পের মতো।

শুনুন মহারাজ!

যে প্রতিকারের উপায় জানে সে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শত্রুকে সমভাবেই উন্মূলিত করতে সমর্থ, নদীবেগ যেমন বৃক্ষ এবং তৃণ উভয়কেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি।

এখন এই দূত শুককে আশ্বাস দিয়ে যত দিন না দুর্গ প্রস্তুত হয় তত দিন এখানে রাখুন। কারণ একজন ধনুর্ধর দুর্গপ্রাকারে থেকে শত যোদ্ধাকে পরাজিত করতে পারে, শত যোদ্ধা অভিভূত করতে পারে সহস্র সেনাকে। সেই জন্যে দুর্গ নির্মাণ করা সঙ্গত।

দুর্গহীন কোন্ রাজার রাজ্য শত্রু কর্তৃক পরাজিত না হয়ে থাকে? যে রাজা দুর্গহীন ও আশ্রয়হীন তার অবস্থা কী রকম? একটি লোক জাহাজ থেকে নীচে জলে পড়ে গেলে যেমন অবস্থা হয় তেমনি (আশ্রয় ও অবলম্বন হারিয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়)।

চারদিকে বেষ্টন প্রাচীরযুক্ত বৃহৎ পরিখাযুক্ত দুর্গ নির্মাণ কর্তব্য। সেই দুর্গে যেন যন্ত্রপাতি থাকে, যথেষ্ট জলের সরবরাহ থাকে। সেই দুর্গ এমন একটি স্থানে নির্মিত হবে যার চার ধারে পাহাড়, নদী ও মরু বনভূমি আছে।

এই সাতটি দুর্গের সম্পদ—দুর্গ হবে সুপ্রশস্ত, এমন স্থান যেখানে অতিকষ্টে প্রবেশ করা যায়; যেখানে জল, খাদ্যশস্য ও জ্বালানি কাঠের প্রচুর সংগ্রহ থাকবে আর যেখানে থাকবে প্রবেশ ও নির্গমনের গোপন পথ।

রাজা বললেন—দুর্গ প্রস্তুত করার ভার কাকে দেওয়া উচিত?

চক্রবাক বলল—সেই কর্মে যে কুশল এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে, যার কোন বাস্তব জ্ঞান নেই অর্থাৎ যে এই কাজে অভিজ্ঞ নয় তাকে নিযুক্ত করলে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে—বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকলেও কিছু হবে না।

তাহলে সারসকে ডাকা হোক। তা-ই করা হল; সারস যখন এলো রাজা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেব, দুর্গ তো আগেই নির্মিত হয়েছে—তার মধ্যস্থলে আছে এক বিশাল সরোবর। এই সরোবরের মধ্যবর্তী দ্বীপে যাতে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।

কারণ, সকল সংগ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধান্য সংগ্রহ; মুখে রত্ন নিক্ষেপ করলেও তা দিয়ে প্রাণরক্ষা হয় না। তাছাড়া—

সকল মশলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ লবণ; লবণ ছাড়া কোন ব্যঞ্জন গ্রহণ করলে গোবরের মতো লাগে।

রাজা বললেন—সত্বর গিয়ে সব কিছুরই ব্যবস্থা কর।

ঠিক এই মুহূর্তে প্রতিহারী পুনরায় প্রবেশ করে জানালো—দেব, কাকরাজ মেঘবর্ণ এসেছেন সিংহল দ্বীপ থেকে; তিনি অনুচরবর্গসহ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার চরণদর্শনের অভিলাষী।

রাজা বললেন—কাক সর্বজ্ঞ এবং বহুদর্শী; বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে অভ্যর্থনা করা উচিত।

চক্রবাক বলল—ঠিক কথা। কিন্তু কাক হল পাখি—এই দিক দিয়ে আমাদের শত্রু-

দলভুক্ত। কীভাবে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো যেতে পারে ? শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

যে মূর্খ নিজের দল ত্যাগ করে অন্য দলে আসক্ত হয়–সে সেই নীলবর্ণ শৃগালের মতো নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনে।

রাজা বললেন–সে আবার কী ?

কথা ॥ সাত

অরণ্যবাসী এক শৃগাল একবার নগরের প্রান্তে ভ্রমণ করতে করতে একটি পাত্রে পড়ে গেল–তাতে ছিল নীলের রস।

সে পাত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না ; যখন সেই নীলভাণ্ডের অধিকারী সকালবেলায় এলেন, সে এমনি ভাণ করল যেন সে মরে গিয়েছে। তিনি তাকে টেনে তুলে নিয়ে এলেন, তারপর কিছু দূরে তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

সেই শৃগাল ছুটে চলে গেল বনে–তারপর নিজের দেহ নীলবর্ণে মণ্ডিত দেখে ভাবল–চমৎকার রঙ হয়েছে আমার ! এর থেকে কিছু স্বার্থসাধন কেন করব না ? এই ভেবে অন্য শৃগালদের ডেকে সে বলল–ভগবতী বনদেবতা আজ নিজের হাতে আমাকে 'সর্বৌষধি'র রসে লিপ্ত করে বনরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করেছেন। সুতরাং আজ থেকে এই বনরাজ্যে সমস্ত কাজ আমার আদেশ অনুসারে পরিচালিত হবে।

শৃগালেরা তার দেহের ঐ রকম বর্ণ দেখে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল— 'মহারাজ যেমন আদেশ করেন।' এই ভাবেই অরণ্যবাসী অন্য সমস্ত প্রাণীর উপরেও তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল ! নিজের জ্ঞাতিজনের সাহায্যেই সর্বত্র তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হল। তখন সে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি উত্তম পরিজন পেয়েছে ; সুতরাং দরবারে অন্য শৃগালদের দেখে তার লজ্জা হল। সে তখন তিরস্কার করে স্বজাতীয়দের তাড়িয়ে দিল।

তখন শৃগালদের বিষণ্ণ দেখে এক বৃদ্ধ শৃগাল বলল–দুঃখ কোরো না। আমরা নীতিবিদ, ওর দুর্বলতার কথাও জানি ; তবু এই মূর্খ আমাদের বিতাড়িত করেছে। সুতরাং এর যাতে ধ্বংস হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে ; এই সব ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি এর বর্ণ দেখেই প্রতারিত হয়েছে–শৃগাল বলে চিনতে পারে নি। এখন এর আসল রূপটি যাতে প্রকাশিত হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যা বলছি তাই কর। আজ সন্ধ্যায় সবাই মিলে ওর সামনে গিয়ে চিৎকার করতে থাকবে। সে ঐ চিৎকার শুনে সাড়া দেবে ; জাতির স্বভাব আর যাবে কোথায় ? কারণ, যার যা স্বভাব তার পক্ষে তা ত্যাগ করা কঠিন। কুকুরকে যদি রাজা করে দেওয়া হয় সে কি আর জুতো কামড়াবে না ?

তোমরা শব্দ করলে সে-ও শব্দ করে উঠবে ; তখন তাকে চিনতে পেরে বাঘ ছুটে এসে তাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে।

তার কথা অনুযায়ী সব করা হল ; তার কল্পনা অনুযায়ী সব ঘটল। শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

শত্রু যদি স্বজাতীয় হয় তবে সে আমাদের গোপনীয় বিষয়, দুর্বলতা ও শক্তি–সব কিছুই জানে। যদি এমন শত্রু আমাদের মধ্যেই বিরাজ করে তবে অগ্নি যেমন শুষ্ক

বৃক্ষকে দহন করে—সে-ও তেমনি আমাদিগকে দহন করবে।

তাই আমি বলছিলাম, আত্মপক্ষ ত্যাগ করে যে শত্রুর দলে যায়, সে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে।

রাজা বললেন—তা হোক, তবু দেখ, এই কাক দূর থেকে এসেছে। ওকে এখানে রেখে দেবার প্রশ্নটা আমরা পরে বিচার করব।

চক্রবাক বলল—দেব, দূত প্রেরিত হয়েছে, দুর্গও সজ্জীভূত। সুতরাং শুকের সঙ্গে দেখা করে তাকে বিদায় দিন। কিন্তু তীক্ষ্নবুদ্ধি দূতের মাধ্যমেই চাণক্য নন্দকে বধ করেছিলেন। সুতরাং জ্ঞানীজন পরিবৃত হয়ে দূতের সঙ্গে দেখা করুন। আপনারও দূতের মধ্যে থাকবে বীরের দল।

তারপর সভার আয়োজন করে শুক ও কাককে ডেকে পাঠানো হল। শুক, তাকে যে আসন দেওয়া হয়েছিল তাতে বসল; পরে মাথাটা কিছু তুলে বলল—'হে হিরণ্যগর্ভ, মহারাজাধিরাজ শ্রীসচ্চিত্রবর্ণ আপনাকে জানাচ্ছেন—'যদি তোমার ধনে বা জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন থেকে থাকে তবে অবিলম্বে এসে আমার চরণে প্রণতি জানাও, তা না হলে বাসভূমি হিসেবে অন্য কোন স্থান ঠিক করে নাও।'

রাজা সক্রোধে বলে উঠলেন—আঃ, এই সভায় কী আমার এমন কোন অনুচর নেই যে এর গলায় হাত দিয়ে বার করে দিতে পারে?

মেঘবর্ণ উঠে বলল—মহারাজ, আদেশ করুন—এই দুষ্ট শুককে আমি বধ করছি। সর্বজ্ঞ (চক্রবাক) রাজাকে এবং শুককে শান্ত করে বলল—শুনুন, সেই সভা সভা নয়, যেখানে বৃদ্ধেরা থাকেন না; তিনি বৃদ্ধ নন যদি তিনি ধর্ম বাক্য না বলেন; এমন ধর্মকথা নেই যাতে সত্য নেই এবং তাকে সত্য বলা চলে না যাতে ছলনার অবকাশ আছে।

ধর্ম এই—ম্লেচ্ছ হলেও দূত বধ্য নয়, রাজা দূতমুখেই কথা বলে থাকেন; উদ্যত শস্ত্রের সামনেও দূত, তাকে যা বলতে বলা হয়েছে তাছাড়া অন্যরূপ বলেন না। তাছাড়া—

দূতের কথা শুনে কেউ নিজের হীনতার কথা ভাবে, না শত্রুর শ্রেষ্ঠতার কথা ভাবে? দূত অবধ্য বলেই সব রকমের কথা বলে থাকেন।

এর পর রাজা আর কাক আশ্বস্ত হলেন। দূতরূপী শুকও উঠে সভা ত্যাগ করল। অবশ্য চক্রবাক তাকে ডেকে আনিয়ে অনেক সান্ত্বনা এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণালংকার প্রভৃতি দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

শুক বিন্ধ্যাচলে ফিরে গিয়ে রাজাকে প্রণাম করল। তাকে দেখে রাজা চিত্রবর্ণ বললেন—শুক, সংবাদ কী? দেশটা কী রকম?

শুক বলল—দেব! সংবাদ সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—যুদ্ধের উদ্যোগ করুন। সেই কর্পূরদ্বীপ দেশটা যেন স্বর্গেরই একটি অংশ, কীভাবে বর্ণনা করব?

তখন রাজা প্রধান অনুচরদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বললেন—এখন যে যুদ্ধ অবশ্যকরণীয় সেই সম্পর্কে আপনারা উপদেশ দিন; যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যখন ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হন তারা ধ্বংস হন; রাজা অসন্তুষ্ট হলে ধ্বংসের আর বাকি থাকে না। গণিকা সলজ্জা হলে নষ্ট হয়—কুলকামিনীরা নির্লজ্জা হলেই নষ্ট হয়।

এক গৃধ্র ছিল—নাম দূরদর্শী। সে বলল—দেব, বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করা বিধিসঙ্গত নয়। কেননা—

যখন নিজের বন্ধু, মন্ত্রী এবং মিত্রস্থানীয় নৃপতিগণ রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং শত্রুরাজ্যে এর বিপরীত অবস্থা—তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে।

ভূমি, বশীভূত নৃপতি এবং স্বর্ণ—এই তিনটিই যুদ্ধের ফল—যখন এই তিনটি নিশ্চিত, একমাত্র তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে।

রাজা বললেন—মন্ত্রী আমার সেনাবাহিনী পরীক্ষা করে দেখুন—এই বাহিনী যুদ্ধের কতটা উপযোগী তা বোঝা যাবে ; জ্যোতিষীকে ডাকুন ; তিনি যাত্রার শুভসময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। মন্ত্রী বললেন—তথাপি সহসা যুদ্ধযাত্রা অসঙ্গত। কেননা—

যে মূর্খদল বিচার না করে শত্রুসৈন্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ভাগ্যে ঘটে শত্রুর অসিধারের তীক্ষ্ণ আলিঙ্গন।

রাজা বললেন—মন্ত্রী, আমার উৎসাহভঙ্গ কোরো না। জয়ার্থী রাজা কীভাবে শত্রু রাজ্য আক্রমণ করবে—সেই কথা বল।

গৃধ্র বলল—আমি সেই কথাই বলব। কিন্তু তা পালন করলেই ফলপ্রদ হবে, না করলে কোন ফল নেই। শাস্ত্রে বলে, যদি পালন না করা হয় তবে শাস্ত্রানুযায়ী উপদেশ দিয়ে লাভ কী ? কেবলমাত্র ঔষধের জ্ঞানেই রোগের আরোগ্য হয় না।

কিন্তু রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়—সুতরাং আমি যা শুনেছি তাই বলব—আপনি শুনুন।

নদী, পর্বত, অরণ্য, উপত্যকা প্রভৃতি যে-সব স্থানে বিপদের আশঙ্কা বর্তমান—সেখানে সেনাপতি তার বাহিনীকে যুদ্ধার্থে শ্রেণী বিন্যাস করে যাত্রা করবেন।

সকলের পুরোভাগে থাকবেন সেনাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ বীরদের নিয়ে ; মধ্যে থাকবেন নারীগণ, রাজা, অর্থভাণ্ডার এবং বাহিনীর সাধারণ অংশ।

দুই পাশে থাকবে অশ্ববাহিনী, অশ্বের দুই পাশে রথ, রথের দুই পাশে হস্তী, হস্তীর দুই পাশে পদাতিক সৈন্য।

হে রাজন, সকলের পশ্চাতে থাকবেন সেনাপতি, সঙ্গে থাকবেন মন্ত্রিগণ এবং সাহসী বীরগণ—যারা শ্রান্ত এবং বাহিনীর পিছনে আছে তাদের উৎসাহ দিতে দিতে তারা যাবেন।

জলযুক্ত, পাহাড়ে ঘেরা, এবং অসমতল স্থান অতিক্রম করতে হবে হস্তীর সাহায্যে, সমতলভূমি অশ্বের সাহায্যে এবং নদীসংকুল স্থান নৌকার সাহায্যে আর সমস্ত স্থানেই পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে।

আসন্ন বর্ষায় হস্তিবাহিনী নিয়ে যাত্রাই প্রশস্ত অন্য সময়ে অশ্ববাহিনী নিয়ে আর পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে সকল সময়েই যাত্রা করা।

পর্বতে এবং কঠিন গিরিপথে রাজাকে রক্ষা করতে হবে ; সাহসী সৈন্যগণ তাকে রক্ষা করলেও তিনি ঘুমোবার সময়েও জেগে থাকবেন। (অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থাতেও যেন তার অর্ধবোধ থাকে)।

দুর্গম স্থানগুলিতে শত্রুদলকে ঠেলে নিয়ে তাদের বিপন্ন করে ধ্বংস করতে হবে—এবং একই সময়ে শত্রুর দেশে প্রবেশ করতে হবে আরণ্যক সৈন্যবাহিনীকে সামনে রেখে।

যেখানে রাজা সেখানেই সম্পদের অস্তিত্ব। সম্পদ ছাড়া রাজার অস্তিত্ব নেই। সম্পদ ভাণ্ডার থেকেই রাজা তার ভৃত্যদের বেতন দিয়ে থাকেন। যিনি মুক্তহস্তে দান করেন তার জন্যে কে না যুদ্ধ করবে ?

মানুষ মানুষের দাস নয়, মানুষ অর্থের দাস। গৌরব বা অগৌরব নির্ভর করে

ধনশালিতা এবং ধনাভাবের উপর।

ঐক্যমন্ত্রে সংহত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ করতে হবে—রক্ষা করতে হবে পরস্পরকে ; 'অকেজো' সৈন্য রাখতে হবে সেনাবিন্যাসের মধ্যস্থলে।

রাজা পদাতিক সৈন্যদের রাখবেন বাহিনীর পুরোভাগে। শত্রুপক্ষকে অবরোধ করে তিনি প্রতীক্ষা করবেন—শত্রুর দেশ পীড়নও করবেন।

সমতল ক্ষেত্রে রাজা যুদ্ধ করবেন রথ ও অশ্বের সাহায্যে, নৌকা ও হস্তীর সাহায্য নিতে হবে জলপূর্ণ দেশে, যেখানে গুল্ম ও বৃক্ষ সেখানে অস্ত্র হবে ধনুর্বাণ আর উন্মুক্ত ক্ষেত্রে অস্ত্র হবে অসি ও ঢাল।

তিনি অবিরাম চেষ্টা করবেন শত্রুর ঘাস, অন্ন, জল ও ইন্ধনের ভান্ডার ধ্বংস করতে আর আঘাত হানবেন তার সরোবর, দুর্গের প্রাকার এবং পরিখার উপর।

রাজার সৈন্য বিভাগের একটি প্রধান উপকরণ হস্তী। হস্তীর তুল্য এমন উপাদান আর নেই—কেননা তার দেহেই আটটি অস্ত্র বর্তমান।

অশ্ব সেনাবাহিনীর বল, কেননা অশ্ব যেন গতিশীল প্রাণকার। যে রাজার অশ্বের সংখ্যা অধিক তিনি স্থল যুদ্ধে বিজয়ী হন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অশ্বপৃষ্ঠে থেকে যারা যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন। কারণ শত্রুরা দূরে থাকলেও যেন তাদের নাগালের মধ্যে এসে যায়।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শত্রুপক্ষের উপর প্রথম আঘাত করা, সমগ্র সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধান, চারদিকের পথ সংস্কার—(এই তিনটি) পদাতিক সৈন্যের কর্তব্য।

সেই সৈন্যবাহিনীকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয় যেখানে সৈন্যগণ স্বভাবতই বীর, অস্ত্রজ্ঞ, প্রভুর প্রতি অনুগত, শ্রমজয়ী এবং প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ থেকে সংগৃহীত।

হে রাজন ! প্রভুর কাছে সম্মান লাভ করেই মানুষ এ পৃথিবীতে যুদ্ধ করে ; প্রভূত অর্থের বিনিময়েও তা তারা করে না।

নির্বাচিত লোক দিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী অনেক ভালো—কেবলমাত্র সংখ্যাপূরণের জন্যে লোক সংগ্রহ অসঙ্গত। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে—দুর্বলের পরাজয় একদিন শক্তিমানের পরাজয়কেও ডেকে আনে।

অনুগ্রহের প্রত্যাহার, সম্মানজনক পদলাভে ব্যর্থতা, অন্যকে দেয় অংশ আত্মসাৎ করা, অনিয়োগ হেতু বৃথা কালক্ষেপ, অন্যায়ের অপ্রতিকার—এগুলিই সেনাদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ।

জয়লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজপক্ষীয় সৈন্যদের অধিক পীড়ন না করে শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করবেন। শত্রুর সৈন্য দীর্ঘ অভিযানের ফলে পরিশ্রান্ত—তাই সহজেই জয়ের যোগ্য।

শত্রুপক্ষের কোন নিজের জন ছাড়া শত্রুবিজয়ে আর অধিকতর চতুর নীতি কী হতে পারে ? তার সাহায্যেই শত্রুর পতন ঘটানো সম্ভব। শত্রুর কোন আত্মীয়কেই এ ব্যাপারে নিয়োগ করা উচিত।

এইভাবে কোন যুবরাজ বা শত্রুপক্ষের কোন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করতে হবে। তারপর তার সাহায্যেই করতে হবে গৃহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা করবেন স্থিরচিত্ত অভিযানকারী।

শত্রুর কোন আত্মীয় যদি ক্রুর হয় তবে তার সামনে পলায়নের ভাণ করে সহসা তাকে

আঘাত করতে হবে অথবা তার গোধন আত্মসাৎ করে অথবা তার প্রধান অনুচর ও আশ্রিত-দের বন্দী করে তাকে বশীভূত করতে হবে।

রাজা অন্য বিজিত দেশের লোকদের নিজের দেশে বসবাস করিয়ে স্বদেশের লোকবৃদ্ধি করবেন। এই সব লোক তিনি আনবেন নিজের বাহুবলে অথবা দান ও মানের দ্বারা বশীভূত করে। এইভাবে নিজের রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে।

রাজা বললেন—আঃ, এ বিষয়ে এত কথা বলার কী প্রয়োজন? নিজের শক্তির বৃদ্ধি, শত্রুর শক্তির ক্ষয়—এই দুটিই তো নীতি। নীতিবিদ্‌ ব্যক্তিগণ এই দুটিকে অবলম্বন করেই বাগ্মিতা প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ বৃহস্পতির ভূমিকা গ্রহণ করেন)।

মন্ত্রী মৃদু হেসে বললেন—সে কথা সত্য। কিন্তু অসংযত শক্তির প্রকাশ এক ব্যাপার, নীতি-নিয়ন্ত্রিত শক্তি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। আলো আর অন্ধকার একই স্থানে অবস্থান করতে পারে না।

এর পর রাজা জ্যোতিষী-নির্দিষ্ট লগ্নে যাত্রা করলেন।

এদিকে রাজদূত কর্তৃক প্রেরিত চর এসে হিরণ্যগর্ভকে জানালো—দেব! রাজা চিত্রবর্ণ প্রায় সমাগত, তিনি মলয়পর্বতের উপরিস্থিত বিস্তৃত ভূমিতে সেনানিবেশ করেছেন। এখন প্রতিক্ষণেই সযত্নে দুর্গ পরীক্ষা করা উচিত—কারণ গৃধ্র এক নাম-করা পাকা রাজ-নীতিবিদ্‌। কারো সঙ্গে ওর গোপনীয় কথা প্রসঙ্গে আমি ওর গোপনীয় সংবাদ জানতে পেরেছি—আমাদের দুর্গের মধ্যেই ওর কোন লোক নিযুক্ত হয়েছে।

চক্রবাক বলল—দেব, (আমার মনে হয়) কাকই ওদের নিযুক্ত চর!

রাজা বললেন—এ কখনো হতে পারে না। তাই যদি হবে তবে সে শুককে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিল কেন?

তাছাড়া,—শুক চলে যাবার পরই যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠেছিল—সে তো এখানে অনেকক্ষণ ধরেই আছে।

মন্ত্রী বলল—তবু আগন্তুককে সন্দেহ করা উচিত।

রাজা বললেন—কিন্তু আগন্তুকেরাও কখনো কখনো উপকারী হয়ে থাকে। দেখ,—

আগন্তুকও যদি মঙ্গলসাধন করে, সে আত্মীয়, আবার আত্মীয়ও যদি ক্ষতি করে তবে সে আগন্তুক (অর্থাৎ শত্রু); রোগের জন্ম দেহে তবু সে ক্ষতিকারক, ঔষধিলতা অরণ্যে থাকে তবু সে হিতকারী বন্ধু। আর একটি কথা—

রাজা শূদ্রকের এক ভৃত্য ছিল—তার নাম বীরবর; অল্পকালের মধ্যে সে (রাজার উদ্দেশ্যে) নিজের পুত্রকে দান করেছিল।

চক্রবাক বলল—কাহিনীটি কী?

রাজা বললেন—

কথা ॥ আট

আগে রাজা শূদ্রকের ক্রীড়া-সরোবরে এক রাজহংস থাকত; তার নাম কর্পূরকেলি। আমি কর্পূরকেলির কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর প্রেমাসক্ত হয়েছিলাম। বীরবর নামে কোন এক দেশের রাজপুত্র রাজদ্বারে এসে রক্ষীকে বলল—আমি রাজপুত্র—চাকুরি-প্রার্থী, রাজদর্শন করাও। তারপর রাজার সামনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল—সে বলল—মহারাজ

যদি আমাকে আপনার ভৃত্যরূপে নিয়োগ করতে চান তবে আমার বেতন নির্দিষ্ট করুন।

শূদ্রক বললেন—তুমি কত বেতন চাও ?

বীরবর বলল—প্রতিদিন চারশো স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা বললেন—তোমার করণ কী ? (অর্থাৎ তোমার কাজের উপাদান কী ? কী দিয়ে তুমি কাজ করবে) ?

বীরবর বলল—দুই বাহু আর এক খড়্গ।

রাজা বললেন—অত বেতন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এই কথা শুনে বীরবর রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল। মন্ত্রীরা বললেন—দেব, চারদিনের বেতন দিয়ে একে পরীক্ষা করে দেখুন সে এই বেতনের যোগ্য কী অযোগ্য। তখন মন্ত্রীদের প্রস্তাব অনুযায়ী বীরবরকে ডাকিয়ে আনা হল, তাকে তাম্বূল চারশত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হল।

রাজা খুব গোপনে লক্ষ্য করলেন সে এই অর্থ কীভাবে ব্যয় করে। অর্থের অর্ধেক বীরবর দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান করল ; অবশিষ্ট অর্থের অর্ধেক সে দান করল বিপন্ন ও আর্তের সেবায়। অবশিষ্ট যা রইল তা পরিবারের খাদ্য ও বিলাসে ব্যয় করল। প্রতিদিনের এই কর্তব্যপালনের পর সে খড়্গ হস্তে রাজদ্বারে দিনে ও রাত্রিতে দাঁড়িয়ে থাকত। রাজা নিজে আদেশ করলে সে স্বগৃহে যেত।

তারপর এক কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রিতে রাজা এক রমণীর ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। শূদ্রক বললেন—দ্বারে কে ? বীরবর বলল—দেব, আমি বীরবর।

রাজা বললেন—রোদনধ্বনি অনুসরণ কর।

বীরবর বলল—'আপনার যেমন আদেশ।' এই বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

রাজা ভাবলেন—একাকী এই রাজপুত্রকে আমি সূচিভেদ্য অন্ধকারে পাঠিয়ে দিলাম —এটা অনুচিত। এর অনুসরণ করে আমি জানব ব্যাপারটা কী ? তখন রাজাও খড়্গ হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে নগর ছাড়িয়ে বাইরে চলে এলেন।

এদিকে বীরবর যেতে যেতে এক সর্বালংকারা রূপযৌবনবতী রমণীকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—আপনি কে ? কেন কাঁদছেন ?

রমণী বললেন—আমি শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী—দীর্ঘকাল এর ভুজচ্ছায়ায় সুখে বাস করে এসেছি ; এখন আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। বীরবর বলল—যেখানে বিপদ সেখানে প্রতিকারের উপায়ও আছে ; এখানে কীভাবে অবস্থান সুনিশ্চিত করা যেতে পারে ? রাজলক্ষ্মী বললেন—যদি তুমি তোমার বত্রিশ শুভলক্ষণযুক্ত পুত্র শক্তিধরকে ভগবতী সর্বমঙ্গলাকে উপহার দিতে পারো, তবে আমি দীর্ঘকাল এখানে সুখে থাকতে পারব। —এই বলে দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তখন বীরবর নিজের গৃহে ফিরে এসে নিদ্রিতা স্ত্রীকে জাগালো, পুত্রকেও জাগালো। তারা নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে বসল, বীরবর তাদের কাছে রাজলক্ষ্মীর ব্যাপারটি খুলে বলল। শুনে আনন্দিত শক্তিধর বলে উঠল—আজ প্রভুর রাজ্যরক্ষার্থে আমার প্রয়োজন হয়েছে, আমি ধন্য। পিতঃ, তবে আর বিলম্ব কেন ? যখনই হোক না কেন, এই ধরনের শুভ উপলক্ষ্যে দেহদান সে তো গৌরবের। কেননা—

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধন ও জীবন পরার্থে উৎসর্গ করবেন। মৃত্যু যখন ধ্রুব তখন শুভকাজে এই ত্যাগ প্রশংসার যোগ্য।

শক্তিধরের মাতা বলল—যদি তা না করা হয় তবে আর কোন্ উপায়ে রাজার এই বেতনের ঋণশোধ হতে পারে? এই রকম আলোচনা করে তারা সবাই মিলে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে গেল। সেখানে সর্বমঙ্গলার পূজা করে বীরবর বলল—দেবি, প্রসন্ন হও। মহারাজ শূদ্রকের শ্রীবৃদ্ধি অক্ষয় হোক; আমার এই উপহার তুমি নাও! এই বলে পুত্রের মস্তক ছিন্ন করল।

তখন বীরবর ভাবল—গৃহীত রাজবেতনের ঋণ পরিশোধ করেছি; এখন পুত্রহীন আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভেবে সে নিজের শিরশ্ছেদ করল। স্বামী ও পুত্রের শোকে বীরবরের পত্নীও একই পথ অনুসরণ করল।

এই সব দেখে-শুনে রাজা বিস্মিত হয়ে ভাবলেন আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীরা জন্মায় আর মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু এর মতো মানুষ পৃথিবীতে আর হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

এই বীরবরই যখন আমাকে ছেড়ে গেল তখন আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নেই। তারপর নিজের মস্তক ছেদনের জন্যে রাজা শূদ্রক খড়্গ তুললেন সেই মুহূর্তে ভগবতী সর্বমঙ্গলা আবির্ভূত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন পুত্র, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আর সাহসে প্রয়োজন নেই। তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার রাজ্য নিরাপদ থাকবে। রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন—দেবি, আমার রাজ্যেও প্রয়োজন নেই, জীবনেও প্রয়োজন নেই। আমার প্রতি যদি অনুগ্রহ করলেন তবে আমার অবশিষ্ট আয়ুর বিনিময়ে এই বীরবর পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে জীবিত হোক। তা না হলে আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ভগবতী বললেন—পুত্র, তোমার এই অপূর্ব ভৃত্যবাৎসল্যে আমি সন্তুষ্ট। যাও, তুমি বিজয়ী হবে। এই রাজপুত্রও সপরিবারে জীবিত হোক—এই বলে অদৃশ্য হলেন। বীরবর পুত্র ও পত্নীর সঙ্গে নতুন জীবন লাভ করে গৃহে ফিরে গেল।

রাজাও সকলের অলক্ষ্যে প্রাসাদে ফিরে এসে আগের মতোই শুয়ে রইলেন।

বীরবর যখন দ্বারে এসে দাঁড়াল—তখন রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন। বীরবর উত্তরে বলল সেই ক্রন্দনপরায়ণা রমণী আমাকে দেখেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এছাড়া অন্য-কোন সংবাদ নেই। তার কথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হলেন-বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—এই ব্যক্তি মহানুভব, সকল রকমের প্রশংসার যোগ্য। কেননা—

উদার হয়ে প্রিয়ভাষণ করবে, বীর হয়ে গর্বপ্রকাশ করবে না, দাতা হয়ে অপাত্রে দান করবে না, সাহসী হয়েও নিষ্ঠুর হবে না।

এই সব মহাপুরুষের লক্ষণ - সবই এর মধ্যে বর্তমান। তারপর রাজা পরদিন প্রভাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা ডেকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। আর রাজানুগ্রহের চিহ্ন-স্বরূপ বীরবরকে দান করলেন কর্ণাটরাজ্য। কাহিনী শেষ করে হিরণ্যগর্ভ বললেন - আগন্তুক হলেই কেউ ভ্রষ্ট হয় না—তাদের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম আছে।

চক্রবাক বলল রাজার ইচ্ছার মান রাখতে গিয়ে, যা করণীয় নয় তাকে কর্তব্য বলে রাজার কাছে যে ব্যাখ্যা করে সে মন্ত্রী নিন্দনীয়। প্রভুর মনে একটু দুঃখ যদি হয় তা-ও ভালো—কিন্তু অকার্য করে তার সর্বনাশ ডেকে আনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

রাজার চিকিৎসক, ধর্মগুরু এবং মন্ত্রী যদি স্তাবক হয় তাহলে সেই রাজা দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্য, ধর্ম ও অর্থ থেকে বঞ্চিত হন। শুনুন দেব!

কোন ব্যক্তি পুণ্যের জোরে যা লাভ করেছে আমিও তা পাব—এই ভেবে এক

নাপিত লোভে সম্পদ কামনা করল—ফলে এক ভিক্ষুককে বধ করায় তাকেও হত হতে হল।

রাজা প্রশ্ন করলে—সে কী?

মন্ত্রী বলতে লাগল—

কথা ॥ নয়

অযোধ্যা নগরে চূড়ামণি নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্পদলাভের কামনায় তিনি দীর্ঘকাল দেহের ক্লেশ সহ্য করেও শিবের আরাধনা করেছিলেন। এইভাবে পাপের মোচন হলে পর শিবের আদেশে যক্ষপতি তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে এই আদেশ করলেন—তুমি আজ সকালে ক্ষৌরকার্য করে লাঠি হাতে নিয়ে গোপনে তোমার গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর যে কোন ভিক্ষু তোমার গৃহের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াবে—তাকেই তুমি তোমার লাঠি দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত করতে থাকবে। দেখবে সেই মুহূর্তেই ভিক্ষু স্বর্ণমুদ্রায় ভর্তি এক কলসে পরিণত হয়েছে। সেই অর্থে তুমি তোমার অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটতে পারবে।

চূড়ামণি এই নির্দেশ পালন করল—যেমন বলা হয়েছিল তেমন ফলও পেল। এদিকে ক্ষৌরকার্যের জন্যে যে নাপিতকে আনা হয়েছিল সে ব্যাপারটা দেখল। সে ভাবল—

সম্পদলাভের এই বুঝি উপায়। আমি একবার চেষ্টা করি না কেন? তারপর থেকে সে প্রতিদিন সেইভাবে লাঠি হাতে নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করত কখন ভিক্ষু আসে। একদিন এক ভিক্ষু এলো—তাকে দেখেই সে লাঠির আঘাতে তাকে বধ করল। আর সেই অপরাধে রাজপুরুষদের দ্বারা দণ্ডিত হয়ে সে প্রাণত্যাগ করল।

তাই বলছিলাম—পুণ্যের জোরে কোন ব্যক্তি যা লাভ করেছে—

রাজা বললেন—শুধু অতীতের কাহিনী শুনেই কী করে বোঝা যাবে যে কোন লোক অকৃত্রিম বন্ধু না বিশ্বাসঘাতক।

থাক ও সব কথা। যেটা আমাদের এখনকার কাজ তাতেই মন দেওয়া যাক। চিত্রবর্ণ যদি মলয়পর্বতে এসে থাকে— তবে এই অবস্থায় আমাদের সবচেয়ে ভালো পথ কী?

মন্ত্রী বলল যে গুপ্তচর এখানে এসেছে—তার মুখে আমি শুনেছি চিত্রবর্ণ নাকি তার মন্ত্রী গৃধ্রের পরামর্শ তুচ্ছ করেছে। তাহলে এই মূর্খকে জয় করা কঠিন হবে না। কেননা—

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যে শত্রু লোভী, নিষ্ঠুর, অলস, বিশ্বাসঘাতক, অসতর্ক, ভীরু, চঞ্চল, নির্বোধ এবং যোদ্ধাদের যে অপমান করে তাকে সহজেই ধ্বংস করা যায়।

সুতরাং সে আমার দুর্গদ্বার অবরোধ করার আগেই তার সেনাবাহিনীকে নদী, পর্বত ও অরণ্যপথে বিতাড়িত করে তাদের বিনষ্ট করার জন্যে সারস ও অন্যান্য সেনাপতিদের আদেশ দিচ্ছি। কেননা—

শাস্ত্রে বলেছে—রাজা তখনই তার শত্রুসেনা বিনষ্ট করাবেন যখন দেখা যাবে, সেই বাহিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ফলে ক্লান্ত, যখন সেই বাহিনী চারদিকে নদী, পর্বত ও বনের দ্বারা বেষ্টিত, ভীষণ অগ্নির ভয়ে সন্ত্রস্ত কিংবা ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন—যখন সেই বাহিনী অসতর্ক, ভোজনে ব্যগ্র, রোগ ও দুর্ভিক্ষে পীড়িত কিংবা যখন সেই বাহিনী বিশৃঙ্খল, সংখ্যায় অল্প, বর্ষণে ও ঝটিকায় ক্লিষ্ট, ধূলি ও জলাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত

এবং সেই কারণে বিচ্ছিন্ন অথবা যখন সেই বাহিনী দস্যুভয়ে পলায়িত। তাছাড়া–

যখন আক্রমণের ভয়ে রাত জেগে শত্রুসৈন্যবাহিনীর সকলে দিনে সুপ্ত হয়ে আছে তখনই সেই নিদ্রায় অভিভূত সেনাদের রাজা আক্রমণ করে ধ্বংস করবেন।

সুতরাং আমাদের সেনাপতিগণ অসতর্ক রাজার সেনাদলকে দিবানিশি আঘাত করে বিধ্বস্ত করুক। সুবিধা পেলেই আঘাত করে যেতে হবে।

এইভাবে সব করা হল। নিহত হল চিত্রবর্ণের সেনাদলের অনেকে আর সেনাপতিরা। বিষণ্ণ হয়ে সে তখন দূরদর্শী নামক তার মন্ত্রীকে বলল–মশাই, আপনি কেন আমাদের উপেক্ষা করছেন? আমি কি কোথাও কোন ব্যাপারে আপনাকে অপমানিত করেছি?

শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

রাজ্যের অধিকারী হয়েছে বলে কারও পক্ষে অশোভন ব্যবহার করা উচিত নয়; কারণ বার্ধক্য যেমন সৌন্দর্য নষ্ট করে, অবিনয়ও তেমনি সম্পদ ধ্বংস করে। তাছাড়া–

যে পরিশ্রমী সে সম্পদ লাভ করে, যে হিতকর বস্তু আহার করে সে স্বাস্থ্য লাভ করে, স্বাস্থ্যবান সুখ লাভ করে, উদ্যোগী সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করে, আর যে সুশিক্ষিত সে লাভ করে ধর্ম, অর্থ এবং যশ।

গৃধ্র বলল–দেব! শুনুন–

রাজা অশিক্ষিত বা নীতিতে অনভিজ্ঞ হলেও নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করে থাকেন যেমন পুষ্ট হয় জলের নিকটবর্তী তরু। তাছাড়া–

সুরাপান, নারীতে আসক্তি, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অর্থের অপব্যয়, এবং বাক্য ও দণ্ডের কঠোরতা–এই ছয়টি রাজাদের সংকটের হেতু। আরও দেখুন–

যে কেবলমাত্র তার সাহস ও শৌর্যের উপরই নির্ভর করে কিংবা কেবলমাত্র কার্যসাধনের উপায় খুঁজতে গিয়েই বিমূঢ় হয়ে পড়ে–এরা কেউ শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হয় না; সুনীতিপরিচালিত শক্তিই শ্রেষ্ঠ সম্পদের হেতু।

আপনি আপনার সেনাবাহিনীর উৎসাহ দেখেই যুদ্ধের অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, আমি যে পরামর্শ দিয়েছিলাম তাতে কর্ণপাত করেন নি। আমার মনে আছে আপনি তখন রূঢ় বাক্যও প্রয়োগ করেছিলেন। এখন আপনি আপনার ভ্রান্ত নীতির ফলই অনুভব করছেন।

শাস্ত্রে বলে–যার মন্ত্রী অপদার্থ এমন কোন্ রাজা দুর্নীতিজনিত অনিষ্ট ফল ভোগ না করে? অপথ্যভোজী কোন্ ব্যক্তি না রোগ ভোগ করে? সম্পদ কাকে না প্রমত্ত করে? মৃত্যু কাকে না বিনাশ করে? নারীর প্রণয়কেলি কাকে না ক্লিষ্ট করে?

তাছাড়া, অবসাদ আনন্দকে নষ্ট করে, শীতের আবির্ভাব নষ্ট করে শরতের সৌন্দর্য; সূর্য অন্ধকার নাশ করে; পুণ্যকর্মকে ক্ষুণ্ণ করে অকৃতজ্ঞতা, প্রিয়বস্তুলাভের আনন্দকে মলিন করে দেয় শোক, সত্য নীতি দূর করে সংকটকে, সমৃদ্ধি প্রচুর হলেও তার অবসান ঘটে অবিনয়ে।

তখন আমিও মনে মনে ভেবেছিলাম–এই রাজা অবিবেচক; নইলে, কেন সে সুনীতির আলোককে বাক্যের উল্কা ছড়িয়ে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে? কারণ–

যার নিজের কোন বুদ্ধি নেই শাস্ত্র তার কী করতে পারে? যার চোখই নেই দর্পণে তার কী প্রয়োজন?

এই কারণেই আমিও চুপ করে ছিলাম। রাজা তখন করযোড়ে তাকে বললেন–

ভদ্র, এ সবই আমার অপরাধ, কিন্তু একে উপেক্ষা করুন। এখন আমাকে সেই উপদেশ দিন যাতে আমি অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে বিন্ধ্যপর্বতে ফিরে যেতে পারি।

গৃধ্র ভাবল—এ ব্যাপারে প্রতিকার করতেই হবে। কারণ, দেবতা, গুরু, রাজা, ব্রাহ্মণ, শিশু, বৃদ্ধ এবং রোগী—এদের ক্ষেত্রে ক্রোধকে সংযত করতে হবে।

মন্ত্রী হেসে বলল—মহারাজ, আপনি ভয় পাবেন না, আশ্বস্ত হোন। শুনুন—

ইষ্ট সাধনের উপায় যখন ব্যর্থ হয় তখন মন্ত্রীদের এবং যখন বায়ু, পিত্ত, কফ—তিনটি প্রকুপিত, সেই সান্নিপাতিক রোগে চিকিৎসকদের প্রজ্ঞা পরীক্ষিত হয়ে থাকে। যখন সব কিছু সুস্থ রীতিতে চলতে থাকে তখন কে না পণ্ডিত? আরও দেখুন—

মূর্খেরা আরম্ভ করে অল্প এবং অল্পেই বিহ্বল হয়ে পড়ে; স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বৃহৎ কাজে লিপ্ত হন এবং অচঞ্চল থাকেন।

সুতরাং এই ক্ষেত্রে আপনার শক্তিবলেই দুর্গ আক্রমণ করে সগৌরবে এবং শক্তি-মহিমায় আপনাকে অচিরেই বিন্ধ্যাচলে নিয়ে যাব। রাজা বললেন—এখন এই অল্প সেনাবলের সাহায্যে কী ভাবে তা সম্ভব হবে? গৃধ্র বলল—সব সম্ভব হবে। কারণ যিনি জয়লাভ করতে ইচ্ছুক তার পক্ষে কার্যতৎপরতাই সিদ্ধির প্রধান উপায়। এই মুহূর্তেই দুর্গদ্বার অবরোধ করার ব্যবস্থা করুন।

এই সময় গুপ্তচর বক এসে হিরণ্যগর্ভকে জানালো—যেহেতু রাজা চিত্রবর্ণের সৈন্যবল অল্প তাই তিনি গৃধ্রের পরামর্শ অনুযায়ী দুর্গের দ্বার অবরোধ করছেন। রাজহংস বললেন—সর্বজ্ঞ, এখন কী করা উচিত? চক্রবাক বলল—আপনার সেনাদলে কারা সবল, কারা দুর্বল—এই বিভাগ করে ফেলুন। তারপর তা জেনে সবল সেনানীদের স্বর্ণ, বস্ত্র এবং রাজানুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ অন্য উপহার দিয়ে তাদের সম্মানিত করুন।

সম্পদলক্ষ্মী কখনও সেই রাজসিংহকে ত্যাগ করেন না যিনি অপব্যয় থেকে একটি মাত্র কড়িকেও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ভেবে সযত্নে সঞ্চয় করেন আবার যোগ্য উপলক্ষ এলে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। আরও দেখুন—

যজ্ঞানুষ্ঠানে, বিবাহ-উপলক্ষে, সংকটনিবারণে, শত্রু-বিনাশে, যশস্কর কর্মে, বন্ধু সংগ্রহে, প্রিয়াবিনোদনে, দরিদ্র পরিজনের ত্রাণে—এই আটটি বিষয়ে 'অতি-ব্যয়' বলে কোন কথা নেই। কারণ—

মূর্খজনেই অল্প ব্যয়ের আশঙ্কায় সর্বনাশ করে বসে। কর ধার্য হবে এই ভয়ে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিসর্জন দেবে?

রাজা বললেন—এই সঙ্কটকালে কীভাবে 'অতিব্যয়' সমর্থন করা যায়? কারণ শাস্ত্রে বলে—

বিপদের নিবারণের জন্যে মানুষের অর্থ সঞ্চয়—

মন্ত্রী—মহারাজের আবার বিপদ কোথায়?

রাজা—লক্ষ্মীও কখনও কখনও চঞ্চলা হন।

মন্ত্রী—অর্থ সঞ্চিত হলেও নষ্ট হয়।

সুতরাং কার্পণ্য ত্যাগ করে আপনার সাহসী সৈন্যদের দানে ও মানে পুরস্কৃত করুন। কেননা, শাস্ত্রে বলেছে—

যে সব যোদ্ধা পরস্পরকে জানে, যারা সন্তুষ্ট এবং প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প এবং যারা

উচ্চবংশজাত—উপযুক্তভাবে সম্মানিত হলে তারা শত্রুসেনা জয় করতে পারে।

আরও দেখুন—এমন কি পাঁচশত যোদ্ধা, যদি তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে, যদি তারা দৃঢ় সংকল্প ও সাহসী হয়—যদি তারা একতাবদ্ধ হয় তবে বিশাল শত্রুবাহিনীকেও পরাজিত করতে পারে। তাছাড়া—

ভালোমন্দের বিচারশক্তি যার নেই, যে উগ্র এবং অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর তাকে শিষ্টজনেরাও ত্যাগ করেন, অন্য সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই।

সত্যনিষ্ঠা, শৌর্য, দয়া, ত্যাগ—এইগুলি রাজার মহৎ গুণ ; যে রাজার এই গুণগুলি নেই তাকে নিন্দিত হতে হয়।

এই জাতীয় উপলক্ষে অমাত্যগণকেও অবশ্যই পুরস্কৃত করা উচিত। শাস্ত্রে আছে—

যার ভাগ্য নিজের সঙ্গে জড়িত এবং যে নিজের উত্থান-পতনের সঙ্গেই ওঠে এবং নামে—সেই বিশ্বস্ত মানুষকেই রাজা তাঁর প্রাণ এবং কোষ রক্ষার জন্যে নিযুক্ত করবেন।

যে রাজার মন্ত্রী হিসেবে আছে কোন ধূর্ত, বা কোন নারী কিংবা শিশু, সেই রাজাকে ভ্রান্তনীতিরূপ পবনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে রাষ্ট্রকর্মরূপ সাগরে নিমজ্জিত হতে হয়।

শুনুন, মহারাজ !

হর্ষ আর ক্রোধ যার সংযত, শাস্ত্রের শিক্ষায় যার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, এবং যে ভৃত্যদের সেবায় নিত্যই তৎপর, পৃথিবী তাকে ধনসম্পদ দান করেন। তাছাড়া—

রাজার পক্ষে অমাত্যদের উপেক্ষা করা কখনও সঙ্গত নয়—তাদের উত্থান ও পতন রাজার সঙ্গেই হয়ে থাকে। কারণ—

গর্বান্ধ রাজা যখন রাষ্ট্রের সংকটময় কর্মসাগরে নিমজ্জিত হন তখন এই মৈত্রীভাবাপন্ন অমাত্যগণই সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেন।

এই সময়ে মেঘবর্ণ এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল—মহারাজ, আমার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করুন। শত্রুসেনা দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করছে—তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। আপনার অনুমতি পেলে আমি বাইরে গিয়ে তাদের সম্মুখীন হয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে পারি। এভাবে আমি মহারাজের অনুগ্রহের ঋণ থেকে মুক্তি পাব।

চক্রবাক বলল—এ হতে পারে না। যদি বাইরে গিয়ে যুদ্ধই করতে হয় তবে দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ নিরর্থক। তাছাড়া—

কুমীর যত দুর্ধর্ষ হোক জলের বাইরে সহজেই বশীভূত হয় ; সিংহ সাহসী হলেও বনের বাইরে এসে হয়ে যায় শৃগালের মতো।

মহারাজ, আপনি নিজে গিয়ে যুদ্ধ দেখুন। কারণ—

সেনাদলকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে—তারা কেমন যুদ্ধ করে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাজার থাকা দরকার। এমন কি, সামান্য কুকুরও প্রভু সঙ্গে থাকলে সিংহের মতো বীরত্ব প্রকাশ করে।

তারপর তারা সবাই মিলে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হল।

এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হল সেখানে।

পরদিন চিত্রবর্ণ গৃধ্রকে বললেন—এইবার আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। গৃধ্র বলল—শুনুন মহারাজ, যখন দুর্গ বেশিক্ষণ শত্রুর সামনে টিকে থাকতে পারবে না

বলে মনে হয়, খুব ক্ষুদ্র আকারের হয় কিংবা মূর্খ বা দুর্বৃত্ত কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয় অথবা সুরক্ষিত না হয় এবং সেই দুর্গ যদি কাপুরুষ সৈন্যের দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে বুঝতে হবে দুর্গ বিপন্ন।

এইগুলির কোনটিই এই দুর্গ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

দুর্গজয়ের চারটি উপায় আছে—ভেদসৃষ্টি, দীর্ঘকালের জন্যে অবরোধ, আক্রমণ এবং তীব্র পৌরুষ।

এই পথেই আমি যথাশক্তি চেষ্টা করব। [কানে কানে] এইভাবে, এই পথে।

সূর্যোদয়ের আগেই দুর্গের চারটি দ্বারেই প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ; দুর্গের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি গৃহেই কাকেরা একসঙ্গে আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর চিৎকার শোনা গেল—'শত্রুপক্ষ দুর্গ জয় করেছে, দুর্গ জয় করেছে!' সেই চিৎকার শুনে আর কতগুলি গৃহে সত্যিই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দেখে রাজহংসের সৈনিকেরা এবং অন্যান্য দুর্গবাসীরা দ্রুত হ্রদে প্রবেশ করল। কারণ—

যথাকালে যথাশক্তি সুমন্ত্রণা করা উচিত, সুন্দর বীরত্ব দেখানো উচিত, শোভন সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত—এবং সার্থকভাবে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে পলায়নও করা উচিত। সেই সময়ে ভাবতে বসলে চলে না।

সুখীস্বভাব রাজহংসের গতিও মন্থর। তিনি সারসের সঙ্গে যাচ্ছিলেন এমন সময় চিত্রবর্ণের সেনাপতি মোরগ এসে তাদের আক্রমণ করল—রাজহংস ও সারস শত্রুবেষ্টিত হলেন। হিরণ্যগর্ভ তখন সারসকে বললেন—সেনাপতি সারস, আমার জন্যে তুমি মৃত্যুবরণ কোরো না। চেষ্টা করলে এখনও তুমি আত্মরক্ষা করতে পারো। তুমি যাও, জলের গভীরে প্রবেশ করে নিজের প্রাণ বাঁচাও। সর্বজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার পুত্র চূড়ামণিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কোরো।

সারস বলল—মহারাজ, আপনি এমন করে বলবেন না, এ সব কথা আমার কাছে দুঃসহ। যতকাল আকাশে সূর্য ও চন্দ্র বিরাজিত থাকবে, ততকাল আপনি বিজয়ী থাকুন। রাজন, আমি দুর্গরক্ষার সর্বময় কর্তা—আমার মাংসরক্তের পিচ্ছিল পথেই শত্রুসেনাকে দুর্গে প্রবেশ করতে হবে। আর একটি কথা—

বহু দুঃখেই মেলে এই জগতে
গুণজ্ঞ দাতা আর ক্ষমাশীল প্রভু।

রাজা বলল—সে কথা ঠিক, কিন্তু—

অনুরক্ত, শুচি আর দক্ষ সেবক,
সহজে কি মেলে তাই কভু?

সারস—আরও শুনুন—

যদি যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, তাহলে এখান থেকে চলে যাওয়াই সঙ্গত ছিল—কিন্তু মরণ যখন সুনিশ্চিত তখন যশকে কলঙ্কিত করে কী লাভ? তাছাড়া—

তরঙ্গভঙ্গের মতোই ভঙ্গুর এই জীবনে, পরার্থে প্রাণত্যাগের সুযোগ পুণ্যবলেই সম্ভব হয়।

রাজা, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, সৈন্য, মিত্রশক্তি ও প্রজা—এই আটটি রাষ্ট্রের উপাদান।

আপনি রাজা, আপনি প্রভু—আপনাকে যে কোন উপায়ে রক্ষা করতে হবে। কারণ—

রাজা যখন প্রজাপুঞ্জকে ত্যাগ করেন তখন তারা সমৃদ্ধ হলেও বেঁচে থাকতে পারে না। যার প্রাণ নেই, চিকিৎসক স্বয়ং ধন্বন্তরী হলেও তার কী করবেন ?

আরও দেখুন, রাজা যখন তিরোহিত হন তখন প্রজাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না—যখন রাজা অবস্থান করেন তখন তারাও বিরাজিত থাকে।

এমন সময়ে কোথা থেকে সেনাপতি মোরগ এসে তার নখ দিয়ে রাজহংসের দেহে গভীর আঘাত করল। তখন সারস নিজের দেহ দিয়ে রাজাকে আড়াল করে দাঁড়াল। তারপর সারস মোরগের চঞ্চু ও নখরের আঘাতে অস্থির হয়ে তার দেহ দিয়ে রাজাকে রক্ষা করতে লাগল–শেষে ধাক্কা দিয়ে তাকে জলে ফেলে দিল। সেনাপতি মোরগকে সে তার চঞ্চুপ্রহারে বধ করল। এরপর অনেকে এসে সারসকে আক্রমণ করে তাকে নিহত করল।

এই সময়ে রাজা চিত্রবর্ণ প্রাসাদে প্রবেশ করে সকলকে আদেশ দিলেন দুর্গস্থিত সমস্ত দ্রব্য অধিকার করতে। বন্দীর দল জয়গান করে তাকে অভ্যর্থনা জানালো–তারপর তিনি নিজের শিবিরে ফিরে গেলেন।

কাহিনী শুনে রাজপুত্রেরা বলল–রাজার সেই সৈন্যদলে একমাত্র সেই সারসই গৌরবের অধিকারী যে তার জীবন দিয়েও প্রভুকে রক্ষা করেছিল। কেননা শাস্ত্রে বলে–

সব গোরুই শাবকের জন্ম দেয়–যাদের আকৃতি গোরুর মতোই ; কোন কোনটি আবার এমন সন্তানের জন্ম দেয় যারা হয় দলের সেরা (যূথপতি) আর যাদের স্কন্ধ দৃঢ় ও সুসংহত।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—সেই মহাপ্রাণ সারস বিদ্যাধরী পরিবৃত হয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করুক। কেননা শাস্ত্রে বলে–যারা কৃতজ্ঞ এবং প্রভুভক্ত, এবং প্রভুর জন্যেই জীবন বিসর্জন দেয়–তারাই হয় স্বর্গগামী।

যেখানে কোন সাহসী বীর শত্রুবেষ্টিত হয়ে নিহত হয় সে যদি যুদ্ধে দুর্বলতা প্রকাশ না করে তবে চিরন্তন লোকের অধিকারী হয়।

বিষ্ণুশর্মা বললেন–তোমরা বিগ্রহের কাহিনী শুনলে। রাজপুত্রেরা বলল–শুনেছি, শুনে আমরা তৃপ্ত হয়েছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন–তার সঙ্গে এইটুকু আরও বেশী হোক–হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সেনা নিয়ে রাজগণ আর যুদ্ধ না করুক। নীতি ও মন্ত্রণার পবনে আহত হয়েই শত্রুদল গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করুক।

॥ হিতোপদেশে বিগ্রহ নামক তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

সন্ধি

আবার যখন গল্প প্রসঙ্গ শুরু হল তখন রাজপুত্রেরা বলল—আর্য। বিগ্রহের কথা শুনেছি, এখন সন্ধির কথা বলুন।

বিষ্ণুশর্মা বললেন-শোন। আমি সন্ধির কথাও বলব-তার সূচনা-শ্লোকের মর্মার্থ এই রকম-দুই রাজার মধ্যে মহাযুদ্ধ হল-তাদের সৈন্যবাহিনীও নষ্ট হল, তখন মধ্যস্থরূপে গৃধ্র এবং চক্রবাক বাক্যবিনিময়ের দ্বারা মুহূর্ত কালের মধ্যেই শান্তি স্থাপন করল।

রাজপুত্রেরা বলল—কীভাবে সেই সন্ধি হল? বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন—সেই রাজহংস বললেন, কে আমাদের দুর্গে আগুন লাগিয়েছে? শত্রুপক্ষের কেউ? না শত্রু কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে আমাদের দুর্গবাসীদের মধ্যে কেউ?

চক্রবাক বলল-মহারাজ, আপনার হঠাৎ বন্ধু মেঘবর্ণ সপরিবারে অদৃশ্য হয়েছেন। আমার মনে হয়-এ তারই কাজ। রাজা একটু ভেবে বললেন-এ সব আমারই দুর্দৈবের খেলা। লোকে বলে-সুকল্পিত কার্যও অনেক সময় দৈববশত ব্যর্থ হয়ে যায়--এখানে অপরাধ দৈবের, মন্ত্রীদের নয়।

মন্ত্রী বলল-এও তো বলা হয়-মানুষ সংকটে পড়ে দৈবকে নিন্দা করে, কিন্তু সেই মূর্খ জানে না যে নিজের কর্মদোষেই সে সংকটাপন্ন। তাছাড়া-

হিতকামী বন্ধুদের কথা যে শোনে না সেই দুষ্টবুদ্ধি কূর্মের মতোই কাষ্ঠখণ্ড থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

রাজা বললেন-সে আবার কী?

মন্ত্রী বলল-

কথা ॥ এক

মগধদেশে একটি সরোবর আছে-নাম 'ফুল্লোৎপল'। সেই সরোবরে সংকট ও বিকট নামে দুটি হাঁস বাস করত। তাদের বন্ধু ছিল এক কচ্ছপ -সেও সেই সরোবরে থাকত। তার নাম 'কম্বুগ্রীব'।

একদিন ধীবরেরা সেখানে এসে পরামর্শ করল-আমরা আজ এখানে থাকব, কাল সকালে মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি ধরব। তাদের সেই কথা শুনে কচ্ছপ এসে হাঁস দুটিকে বলল--ধীবরদের কথা শুনলে তো? এখন আমি কী করব? হাঁসেরা বলল--আগে ভালো করে জেনে নাও ধীবরেরা কী করবে; কাল সকালে যা করা কর্তব্য, করা যাবে।

কচ্ছপ বলল-সেটা ঠিক হবে না; কেননা, এই রকম সিদ্ধান্তের কুফল আমি এখানে দেখেছি। এই সম্পর্কে লোকে বলে--অনাগতবিধাতা আর প্রত্যুৎপন্নমতি বেশ সুখেই বেঁচে রইল, মরতে হল 'যদ্ভবিষ্য' নামক কচ্ছপকে।

হাঁসেরা বলল-ব্যাপার কী হয়েছিল বল।

কচ্ছপ বলতে লাগল--

কথা ॥ দুই

অনেক আগে একবার এই সরোবরেই ঠিক এমনিভাবেই ধীবরেরা এসেছিল। তখন তিনটি মাছের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। একটি মাছের নাম অনাগতবিধাতা ; (যে বিপদ আসবার আগেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে) সে বলল--আমার কথা যদি বল, আমি অন্য একটি সরোবরে চলে যাব। এই বলে সে চলে গেল আর একটি সরোবরে। আর একটি মাছের নাম প্রত্যুৎপন্নমতি ; (যে উপস্থিত মতো বুদ্ধি খাটিয়ে সংকটত্রাণের ব্যবস্থা করে) সে বলল–ভবিষ্যতে ঘটনা কী ভাবে ঘটবে তার যখন স্থিরতা নেই তখন আমি কোথায় যাই ? সময় আসুক, তখন যা কর্তব্য তা করা যাবে। কারণ, শাস্ত্রে বলে—

সংকট উপস্থিত হলে যে তার সমাধান করে সে-ই বুদ্ধিমান ; ঠিক যেমন বণিকের পত্নী বণিকের সামনেই তার প্রেমিককে লুকিয়ে রেখেছিল।

যদ্ভবিষ্য (যা হবার তা হোক, এ কথা যে বলে) বলল--সে আবার কী ?

প্রত্যুৎপন্নমতি বলতে লাগল--

কথা ॥ তিন

বিক্রমপুরে এক বণিক থাকত, নাম সমুদ্রদত্ত–তার পত্নীর নাম রত্নপ্রভা ; সে তার নিজের ভৃত্যদের মধ্যেই একজনের সঙ্গে সকল সময় প্রণয়লীলায় মত্ত থাকত। কারণ–

নারীদের অপ্রিয় কিছুই নেই, প্রিয় বলেও কিছু নেই, গোরু যেমন অরণ্যে নূতন তৃণ কামনা করে, তেমনি তারাও চায় নতুন নতুন মানুষ।

একদিন সমুদ্রদত্ত দেখতে পেল রত্নপ্রভা সেই ভৃত্যকে চুম্বন করছে ; কিন্তু সেই কুলটা রমণী তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বলল–ঐ ভৃত্যটির আরাম ভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি ; আমি ওর মুখের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পেরেছি ও চুরি করে কর্পূর খায়। শাস্ত্রে বলে– স্ত্রীলোকের আহারের পরিমাণ (পুরুষের তুলনায়) দ্বিগুণ, তাদের বুদ্ধি চতুর্গুণ ; শ্রমের শক্তি ছয়গুণ আর কামের স্পৃহা আটগুণ।

এই কথা শুনেই সেই ভৃত্য রাগ করে বলল–যে প্রভুর গৃহে এই জাতীয় পত্নী বর্তমান সেই গৃহে ভৃত্য কীভাবে থাকতে পারে ? বিশেষ করে এমন গৃহে যেখানে প্রভুপত্নী প্রতিক্ষণেই ভৃত্যের মুখ আঘ্রাণ করে। এই বলে সে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বণিক অবশ্য সযত্নে তাকে আশ্বস্ত করে নিয়ে তার কাজে বহাল করল। তাই বলছিলাম–সংকট উপস্থিত হলে যে তার সমাধান করতে পারে সে-ই বুদ্ধিমান। যদ্ভবিষ্য বলল–

যা ঘটবে না, তা কোন কালেই ঘটবে না, যা ঘটবেই তার অন্যথাও কোন কালে হবে না–এই জ্ঞানই তো চিন্তাবিষনাশের ঔষধ ; এই ঔষধ কোন্ লোকে সেবন করে না ?

পরদিন প্রভাতে প্রত্যুৎপন্নমতি জালে ধরা পড়ল ; ধরা পড়েই সে এমন ভাণ করল যেন সে মরে গিয়েছে–এবং ঐ ভাবেই পড়ে রইল। শেষে জাল থেকে সরানো হতেই সে যথাশক্তি লাফিয়ে গিয়ে পড়ল গভীর জলে। ধীবরেরা যদ্ভবিষ্যকে ধরে মেরে ফেলল। তাই বলছিলাম অনাগতবিধাতা আর তার দুই বন্ধুর কথা।

কচ্ছপ বলল–এখন আমি যাতে অন্য কোন এক সরোবরে যেতে পারি তার ব্যবস্থা কর। হাঁস দুটি বলল--অন্য জলাশয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তুমি নিরাপদ। কিন্তু স্থলপথে যাবে কী করে ? কচ্ছপ বলল--এমন কোন উপায় স্থির কর যাতে আমি তোমাদের

সঙ্গে শূন্যপথেই যেতে পারি। হাঁস দুটি বলল--তা কেমন করে সম্ভব হবে? কচ্ছপ বলল- তোমরা দুজন একটি কাষ্ঠখণ্ডকে ধরে রাখবে চঞ্চুতে, আমি মুখ দিয়ে তাকে আশ্রয় করে থাকব ; তারপর তোমাদের ডানার জোরে আমিও উড়ে যাব। হাঁস দুটি বলল -এই উপায় সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, উপায়ের কথা ভাবতে গিয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সম্ভাবিত বাধার কথাও ভেবে দেখা উচিত--কেননা, মূর্খ বকের চোখের সামনেই তার সন্তানদের খেয়ে ফেলেছিল এক নকুল।

কচ্ছপ প্রশ্ন করল–সে আবার কী?

তারা বলতে লাগল--

কথা ॥ চার

উত্তরাপথে গৃধ্রকূট নামে এক পর্বত ছিল। সেখানে ইরাবতী নদীর তীরে এক বটগাছে কতগুলো বক থাকত আর গাছের নীচে এক গর্তে একটি সাপ থাকত–আর এই সাপ বকদের ছানাগুলো খেয়ে ফেলত।

তারপর একদিন শোকার্ত বকদের বিলাপ শুনে এক বৃদ্ধ বক বলল–তোমরা একটি কাজ কর ; কিছু মাছ এনে নকুলের গর্ত থেকে সাপের গর্ত পর্যন্ত এক সারিতে একটি একটি করে সেগুলি বিছিয়ে দাও। তখন আহারের লোভে নকুলেরা এসে সাপকে দেখতে পাবে–আর দেখতে পেয়ে স্বাভাবিক শত্রুতাবশতই মেরে ফেলবে।

তারপর সেই ভাবেই কাজ করা হল–এবং যেমন বলা হয়েছিল তেমনই ঘটল। কিন্তু সাপকে মেরে ফেলে নকুলেরা বকদের কোলাহল শুনতে পেল। নকুলেরা তখন গাছে উঠে বকদের ছানাগুলি খেয়ে ফেলল।

তাই আমরা বলছিলাম–উপায় নিয়ে ভাবতে গিয়ে–সম্ভাবিত বিপদের কথাও ভাবতে হবে। ধর, আমরা তোমাকে যখন নিয়ে যাব, লোকে কিছু-না কিছু মন্তব্য করবেই ; তখন তুমি যদি মুখ খুলে উত্তর দিতে যাও তবে তোমার মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং সবদিক দিয়ে ভেবে দেখলে তোমার এইখানেই থাকা উচিত। কচ্ছপ বলল–আমি কি বোকা নাকি? আমি কিছুই বলব না।

তখন সেই ব্যবস্থাই করা হল। কচ্ছপকে সেই অবস্থায় দেখে গোপালকের দল পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল আর অনেক কথা বলতে লাগল। একজন বলল–যদি কচ্ছপটি খসে পড়ে তবে এইখানেই রান্না করে খেয়ে ফেলি। আর একজন বলল–পড়ে গেলে পুড়িয়ে খাওয়াই ভালো। আর একজন মন্তব্য করল–না, ঘরে নিয়ে গিয়ে খাব।

এই সব নিষ্ঠুর কথা শুনে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কচ্ছপ নিজের সংকল্প ভুলে গেল আর বলে উঠল–তোমরা ছাই খাবে! বলতে বলতেই কচ্ছপ পড়ে গেল–গোপালকেরা এসে তাকে মেরে ফেলল।

তাই আমি (মন্ত্রী) বলছিলাম–হিতকামী বন্ধুদের কথা না শুনলে কূর্মের মতোই তাকে মরতে হয়। এই সময়ে দূত রূপে নিযুক্ত বক সেখানে এসে বলল–আমি প্রথমেই বলেছিলাম মহারাজ, প্রতিমুহূর্তে দুর্গ পরীক্ষা করে শোধন করা দরকার, আপনি কানে তোলেন নি।

এই অসতর্কতার ফল আপনি ভোগ করলেন। আর দুর্গদহনের কথা যদি বলেন

তবে তা মন্ত্রী গৃধ্রের নির্দেশে করেছে মেঘবর্ণ নামে সেই কাক।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন–প্রীতি-হেতুই হোক অথবা উপকার করতে গিয়েই হোক, যে তার শত্রুকে বিশ্বাস করে–তার চৈতন্য হয় সর্বনাশের পর–ঠিক যেমন ঘুমন্ত লোকটা গাছ থেকে পড়ে যাবার পরই জেগে উঠেছিল।

বকদূত বলল–দুর্গে আগুন লাগিয়ে যখন মেঘবর্ণ ফিরে গেল তখন চিত্রবর্ণ প্রসন্ন হয়ে ঘোষণা করলেন–এই মেঘবর্ণকে কর্পূর দ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত করা হোক।

কারণ, শাস্ত্রে বলে–যে ভৃত্য কর্তব্য পালন করেছে তার কর্ম নিষ্ফল করে দেওয়া উচিত নয়, বরং ফল (=পুরস্কারাদি), মন ও দৃষ্টি দ্বারা তাকে উৎসাহিত করাই উচিত।

চক্রবাক বলল–তারপর কী হল?

বকদূত বলল–তখন প্রধানমন্ত্রী গৃধ্র বললেন–মহারাজ, এ ভাবে পুরস্কৃত করা অন্যায়, একে অন্য কোন অনুগ্রহ বিতরণ করুন। কেননা, অবিবেচককে উপদেশ দেওয়া মুষলের আঘাতে তুষ ঝাড়ার মতোই ব্যর্থ কাজ; তেমনি নীচ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা বালুকায় মূত্রত্যাগের মতোই নিষ্ফল। তাছাড়া–

নীচ ব্যক্তিকে এমন গৌরবের পদে বসানো যুক্তিহীন; কেননা–

গৌরবের পদ পেয়ে হীন ব্যক্তি তার প্রভুকেই বধ করতে উদ্যত হয়, যেমন ব্যাঘ্রত্ব লাভ করে মূষিক সেই মুনিকেই হত্যা করতে গিয়েছিল।

চিত্রবর্ণ বললেন–সে আবার কী?

প্রধানমন্ত্রী বলতে লাগলেন–

কথা ॥ পাঁচ

মহর্ষি গৌতমের তপোবনে এক মুনি বাস করতেন–তার নাম মহাতপা। তিনি একদিন দেখলেন, আশ্রমের কাছে কাকের মুখ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এক মূষিকশাবক নীচে এসে পড়ল। মুনি স্বভাবতই দয়ালু, নীবার ধানের কণা খাইয়ে ছানাটাকে বড় করে তুললেন।

একদিন এক বিড়াল এলো তাকে খেতে–মূষিক সেই মুনির কোলে আশ্রয় নিল। মুনি বললেন–তুমি মূষিক, আজ থেকে মার্জার হও।

কিন্তু সেই বিড়াল কুকুরকে দেখে পালাতে লাগল। মুনি বললেন–কুকুর দেখে ভয় পাচ্ছ! তুমিই কুকুর হও। কিন্তু সেই কুকুরের ভীষণ বাঘের ভয়। মুনি তাকে বাঘ করে দিলেন। বাঘ হলেও মুনি তাকে মূষিকের মতোই দেখতে লাগলেন।

তারপর সেই মুনি আর বাঘকে দেখে সকলে বলতে লাগল–এই মুনিই একে বাঘ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে বাঘের মনে খুব দুঃখ হল–সে ভাবল–যতদিন এই মুনি বেঁচে থাকবে ততদিন আমার এই পরিচয়ের কলঙ্ক কাহিনী ঘুচবে না। এই ভেবে সে মুনিকে বধ করতে গেল। মুনি তা জানতে পেরে বলে উঠলেন–আবার মূষিক হও! মূষিক তার পূর্বপদ ফিরে পেল।

তাই আমি বলছিলাম, নীচ ব্যক্তি গৌরবের পদ পেয়ে স্বামীকেই বধ করতে উদ্যত হয়; তাছাড়া এ কাজও যে করা সহজ তা ভাববেন না। খুব ভালো, মাঝারি ধরনের

বহু মাছ খেয়ে অত্যন্ত লুব্ধ হয়ে উঠল বক। তারপর তাকে এসে ধরল এক কাঁকড়া, পরে সে মারা গেল।

চিত্রবর্ণ প্রশ্ন করলেন—ব্যাপারটা কী?

মন্ত্রী বলতে লাগলেন—

কথা ॥ ছয়

মালবদেশের একটি সরোবরের নাম 'পদ্মগর্ভ'। এক সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ বক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল—তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব উদ্বিগ্ন। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে এক কাঁকড়া তাকে প্রশ্ন করল—আপনি খাদ্য ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

বক বলল—ভদ্র, শুনুন। আমার জীবনের অবলম্বনই হল মাছ, কিন্তু ধীবরেরা এসে সেই মাছ ধরে নিয়ে যাবে—এমনি একটা কথা নগরের কাছে আমি শুনে এলাম। সুতরাং খাদ্যের অভাবেই আমার মরণ সুনিশ্চিত; এটা জানবার পর থেকে খাদ্যগ্রহণেও আমার আর উৎসাহ নেই।

এই কথা শুনে মাছেরা আলোচনা করল—এখন এই বককে আমাদের উপকারক বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। একেই জিজ্ঞেস করা যাক, আমাদের এখন কী করা উচিত। শাস্ত্রে বলে, শত্রুও যদি উপকারী হয় তবে তার সঙ্গে সন্ধি করা উচিত—কিন্তু মিত্র যদি অপকারী হয় তবে তার সঙ্গে সন্ধি অসম্ভব। কোন লোক মিত্র না শত্রু তা জানার লক্ষণ হল সে উপকার করতে ইচ্ছুক না ক্ষতি করতে ইচ্ছুক।

মাছেরা বলল—ওহে বক, এখন আমাদের নিরাপদ হবার উপায় কী?

বক বলল—অন্য একটি সরোবরে আশ্রয় নিলেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে। (আমার তো শক্তি নেই) তোমাদের আমি একটি একটি করে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। মাছেরা বলল, তাই হোক।

এর পর সেই বক একটি করে মাছ নিয়ে গিয়ে তাকে খেতে লাগল। তারপর কাঁকড়া তাকে বলল—ওগো বক, আমাকেও সেখানে নিয়ে চল। কাঁকড়ার সুস্বাদু মাংস খেতে পারবে এই আশায় বক তাকে খুব আদর করে সঙ্গে নিয়ে তাকে একটি স্থানে মাটির উপর রাখল।

কাঁকড়া দেখল সেখানে চারদিকে মাছের কাঁটা ছড়িয়ে আছে। দেখে সে ভাবল—(সর্বনাশ! এ সব আবার কী?) পোড়াকপাল আমার, তাই মরতে এলাম। যাই হোক, এখন যথাকর্তব্য করি। কেননা—

যতক্ষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত না হয় ততক্ষণই ভয় থেকে ভীত হওয়া চলে। কিন্তু যদি ভয়ের কারণ এসে পড়ে তখন নিশ্চয়ই প্রতিকার করতে হবে। তাছাড়া—

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়ে যদি বোঝেন, পাল্টা আক্রমণ না করলে নিজের কোন উপকার হবে না—তখন তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন।

আর একটি কথা—যুদ্ধ না করলে যখন মরণ নিশ্চিত, যুদ্ধ করলে যখন জীবনের কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা—তখনই তো যুদ্ধের প্রকৃষ্ট সময়।

এই কথা ভেবে সেই কাঁকড়া বকের গ্রীবা ছেদন করল। বকের মৃত্যু হল।

সেই জন্যেই আমি বলছিলাম, বহু রকমের মাছ খেয়ে লুব্ধ হয়ে উঠেছিল বক—যাক

গে। তারপর সেই চিত্রবর্ণ বলতে লাগলেন–শোন মন্ত্রী, আমি ব্যাপারটা নিয়ে এই রকম ভেবেছি। মেঘবর্ণকে যদি এখানকার রাজপদে নিযুক্ত করা হয় তবে সে কর্পূরদ্বীপে উৎপন্ন বহু দ্রব্য আমাকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠাবে।–আমি তাই নিয়ে বিন্ধ্যাচলে বেশ-বিলাসের মধ্যেই জীবন কাটাতে পারব।

দূরদর্শী (মন্ত্রী) হেসে বলল–মহারাজ, যে চিন্তা এখনও ফলবতী হয় নি তাই নিয়ে যে খুশি হয়ে ওঠে সে সেইব্রাহ্মণের মতোই তিরস্কৃত হয়–যে তার পাত্র ভেঙে ফেলেছিল।

রাজা বললেন–সে আবার কী?

মন্ত্রী বলতে লাগল–

কথা ॥ সাত

দেবকোট নগরে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মহাবিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে তিনি একটি ধাতুপূর্ণ পাত্র পেলেন। সেই পাত্রটি নিয়ে তিনি আসছিলেন, পথে রোদের ভীষণ তাপ–তাই পথে তিনি এক কুম্ভকারের মণ্ডপে আশ্রয় নিলেন–সেই ঘরটি ছিল মাটির পাত্রে পূর্ণ–তিনি একপাশে শুয়ে পড়লেন। হাতে তার ছাতু রক্ষার জন্যে একটা লাঠি ছিল। সেই লাঠি হাতে নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন–যদি এই ছাতু বিক্রী করে আমি দশ কড়ি পাই–তাহলে এখানে সেই ঘট আর ছাতু বেচা-কেনা করতে করতে নানা উপায়ে সেই ধনের পরিমাণ বাড়িয়ে, তারপর সুপারি, বস্ত্র প্রভৃতি কিনে আবার বিক্রী করে যখন আমার এক লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত হবে তখন আমি চারটি বিবাহ করব। এদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক রূপযৌবনের অধিকারী তাকেই আমি আদর করব।

এতে অন্য স্ত্রীদের নিশ্চয়ই ঈর্ষা হবে–ফলে তারা বিবাদে মত্ত হবে–তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এই লাঠি মেরে শাসন করব। ভাবতে ভাবতে সে লগুড় ছুড়ে মারল। তাতে ছাতুর পাত্র চূর্ণ হয়ে গেল–ভেঙে গেল আরও অনেক পাত্র। শব্দ শুনে কুম্ভকার এলো। পাত্রগুলির সেই অবস্থা দেখে সে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করে মণ্ডপ থেকে বিতাড়িত করল।

মন্ত্রী বলল–তাই বলছিলাম, যে-চিন্তা এখনও ফলবতী হয় নি তাই নিয়ে খুশি হয়ে ওঠা মূর্খতার পরিচয়।

তখন রাজা নির্জনে গৃধ্রকে বললেন–সখে, এখন কী করা উচিত তাই বল।

গৃধ্র বলল–রাজা যদি মদমত্ত হয় সে যেন মদস্রাবী হস্তীর মতোই উন্মার্গগামী হয়ে ওঠে। তাদের নেতা, পরিচালক বা উপদেষ্টাকে নিন্দার পাত্র হতে হয়। শুনুন মহারাজ–

বলদর্পে অন্ধ হয়ে আমরা কি দুর্গ জয় করেছিলাম? অর্থাৎ আমরা কি যুদ্ধ করে দুর্গ জয় করেছি? না আপনার প্রস্তাবিত কোন কৌশলের সাহায্যে? রাজা উত্তরে বললেন, আপনারই প্রস্তাবিত এক পরিকল্পনার ফলে। গৃধ্র বলল–আমার উপদেশ অনুযায়ী যদি চলতে চান তবে আসুন আমরা নিজের দেশে ফিরে যাই। কেননা–

বর্ষা এলে যদি সমান শক্তিসম্পন্ন শত্রু দ্বারাও আমরা আক্রান্ত হই তবে দেশে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে–এটি আমাদের পক্ষে বিদেশ, সুতরাং সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের জন্যেই, চলুন সন্ধি স্থাপন করে আমরা ফিরে যাই। আমরা দুর্গ অধিকার করেছি, যশও অর্জিত হয়েছে–এই পর্যন্তই আমি অনুমোদন করতে পারি। কারণ–

সেই রাজারই খাঁটি উপদেষ্টা আছে বলতে হবে যদি সেই উপদেষ্টা কর্তব্যকেই

সামনে রেখে—প্রভু কী ভাববেন বা পছন্দ করবেন তা না ভেবে এমন উপদেশ দেয় যা মধুর না হলেও হিতকর।

যুদ্ধে বিনাশ হবেই ; অনেক সময় দুই পক্ষেরই বিনাশ ঘটে। সুতরাং নিজের মঙ্গল বিসর্জন দেবার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।—এই কথা বলেছেন বৃহস্পতি। তাছাড়া—

মূর্খ না হলে কে আর নিজের মিত্রশক্তি, রাজ্য, নিজের জীবন আর নিজের যশ—এই সব বিপন্ন হয় এমন কাজ করবে।

যে সমান শক্তিসম্পন্ন তার সঙ্গে মিত্রজনোচিত সন্ধিই করতে হয়। কেননা—

যুদ্ধে জয় অনিশ্চিত। সুন্দ ও উপসুন্দ—সমান শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে দুজনেই মৃত্যু বরণ করল।

রাজা বললেন—সে আবার কী ?

মন্ত্রী বলতে লাগলেন—

কথা ॥ আট

পুরাকালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই দৈত্য ছিল ; এরা পরস্পর সহোদর ; এরা ত্রিলোকের প্রভুত্ব লাভের কামনায় নানাভাবে দৈহিক ক্লেশ সহ্য করে শিবের আরাধনা করেছিল। দেবতা সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের বর প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু যে সরস্বতী তাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার প্রভাবে তারা যা চেয়েছিল তা না চেয়ে অন্য বস্তু প্রার্থনা করল। তারা বলল—যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আপনার প্রিয়া পার্বতীকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। শিব ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু বর দান করতেই হবে—তাই ঐ দুই মূর্খের হাতে পার্বতীকে দান করলেন।

সেই দুই দৈত্য ছিল পাপ ও অন্ধকারের মূর্ত রূপ—জগৎ-ধ্বংসের কারণ। তারা পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ হল। দুজনেই সেই নারীকে লাভ করার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠল ; দুজনের কণ্ঠেই একটি মাত্র দাবি—'পার্বতী আমার।'

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে স্থির করে নিল সিদ্ধান্তের জন্যে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। তখন শিবই এলেন মধ্যস্থ হয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। তারা বলল—আমরা দুজনেই শক্তিবলে এই নারীরত্ন লাভ করেছি—আপনি বলুন, আমাদের দুজনের মধ্যে কে এর অধিকার পাবে। ব্রাহ্মণ বললেন—ব্রাহ্মণ পূজিত হয় যখন সে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ; ক্ষত্রিয় পূজিত হয় যখন সে বলে শ্রেষ্ঠ, ধনে ও শস্যে পূর্ণ হলে তবেই বৈশ্য হয় পূজিত আর শূদ্র পূজিত হয় সে যখন ব্রাহ্মণের সেবা করে।

তোমরা তো ক্ষত্রিয়ের নীতি অনুসরণ করে চলেছ—সুতরাং যুদ্ধই তোমাদের ধর্ম। ব্রাহ্মণের এই ঘোষণার পরে তারা দুজনেই বলল—'ইনি ঠিক কথাই বলেছেন।' ওরা সমান শক্তিসম্পন্ন—পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল সমান বেগে। তারপর সেই যুদ্ধেই ওদের বিনাশ ঘটল।

তাই আমি বলছিলাম—যে সমান শক্তিসম্পন্ন তার সঙ্গে সন্ধি করাই সঙ্গত।

রাজা বললেন—আপনি কেন আগে তা বলেন নি ? মন্ত্রী বললেন—আমার কথা তো শেষ পর্যন্ত শোনেন নি। তাছাড়া এই যুদ্ধও আমার সম্মতি নিয়ে করা হয় নি। এই

হিরণ্যগর্ভের এমন সব গুণ আছে যাতে মনে হয় সে সন্ধির যোগ্য—এর সঙ্গে যুদ্ধ অসঙ্গত। শাস্ত্রে বলে—

এই সাত শ্রেণীর নরপতি সন্ধির যোগ্য—যিনি সত্যশীল, যিনি আর্যভাবাপন্ন, যিনি ধার্মিক, যিনি অনার্য, যিনি আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে মৈত্রীযুক্ত, যিনি শক্তিমান এবং যিনি অনেক যুদ্ধে জয়ী।

যিনি সত্যশীল তিনি কখনও সত্য থেকে ভ্রষ্ট হন না সুতরাং সন্ধির পর তার রূপান্তর ঘটে না, আর যিনি আর্যভাবাপন্ন, প্রাণ গেলেও তিনি অনার্য আচরণ করেন না।

ধার্মিক রাজা আক্রান্ত হলে সকলেই তার জন্যে যুদ্ধ করে থাকে ; তার প্রজা-প্রীতি এবং কর্তব্য-প্রীতির জন্যেই তাকে উচ্ছেদ করা কঠিন।

বিনাশ যখন উপস্থিত তখন অনার্যের সঙ্গেও সন্ধি বরণীয় ; কেননা, তার সাহায্য ছাড়া ধার্মিকের পক্ষে নিশ্চিন্তে কাল যাপন করা সম্ভব নয়।

কাঁটায় আচ্ছন্ন বাঁশ যেমন সহজে উন্মূলিত করা যায় না—তেমনি বহু পরিজনের সঙ্গে যিনি মৈত্রীযুক্ত তাকেও ভেদ করা কঠিন।

এমন কোন বিধান নেই যা বলবানের সঙ্গে যুদ্ধের পরামর্শ দেয়। মেঘ বায়ুর বিপরীত মুখে চলতে পারে না।

পরশুরামের মতো যিনি বহুযুদ্ধজয়ী, তাঁর শক্তিমহিমায় সকলেই সর্বত্র এবং সর্বকালে ইচ্ছানুযায়ী ভোগ করতে পারে।

বহুযুদ্ধবিজয়ীর সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপন করে বহুযুদ্ধবিজয়ীর পরাক্রমেই শত্রুগণ তার বশ্যতা স্বীকার করে।

এই রাজা বহুগুণান্বিত—সুতরাং এর সঙ্গে সন্ধি করাই সঙ্গত। চক্রবাক বলল—দূত, আমরা সবকিছুই জেনেছি। অন্য কিছু জ্ঞাতব্য যদি থেকে থাকে, জেনে এসে খবর দাও।

রাজা চক্রবাককে প্রশ্ন করলেন—তারা কারা যাদের সঙ্গে সন্ধি করা সঙ্গত নয় ? আমি তাদের কথাও জানতে চাই। মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, আমি সে-কথা বলছি, শুনুন।

যে বালক, যে বৃদ্ধ, যে দীর্ঘকাল যাবৎ রোগ ভোগ করছে, যে জ্ঞাতি থেকে বহিষ্কৃত, নিজে ভীরু অথবা, যার ভৃত্য ভীরু, যে নিজে লুব্ধ অথবা যার ভৃত্যগণ লুব্ধ, যার প্রজাগণ অনুরক্ত নয়, যে বিষয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, মন্ত্রণা গ্রহণ কালে যে চঞ্চল, যে দেব ব্রাহ্মণের নিন্দুক, যে ভাগ্যাহত এবং যে ভাগ্যনির্ভর, দুর্ভিক্ষের দ্বারা যে পীড়িত, যে সৈন্য ভয়ে ভীত, যে স্বদেশবাসী নয়, যার অনেক শত্রু আর যে সত্য ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত—এই বিংশতি শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সন্ধি করা অসঙ্গত।

এদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই উচিত, কেননা, যুদ্ধের চাপে পড়ে এরা সহজে শত্রুর বশীভূত হয়।

বালকরাজার অল্প শক্তি বা প্রভাব থাকার জন্যে, লোকে তার পক্ষে যুদ্ধ করতে চাইবে না, অল্পবয়স্কতার জন্যেই সে যুদ্ধ করা বা না করার ফলাফল জানতে পারবে না।

যে বৃদ্ধ বা দীর্ঘকাল যাবৎ রুগ্ন—সে উৎসাহহীনতার জন্যে নিজের লোকের হাতেই পরাভূত হবে, এতে সন্দেহ নেই।

জ্ঞাতিগণ যাকে বহিষ্কৃত করেছে তাকে সহজেই উন্মূলিত করা সম্ভব, কেননা তার

জ্ঞাতিগণকে স্ববশে আনতে পারলে তারাই তাকে বধ করবে।

যুদ্ধ পরিত্যাগের জন্যেই ভীরু নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। যার অনুচরগণ ভীরু তারা তাকে যুদ্ধকালে ত্যাগ করে।

যে নরপতি লুব্ধ সে যুদ্ধজয়ের ফলে অর্জিত সম্পদ অনুগতদের মধ্যে ভাগ করে দেয় না, তার ফলে তার জন্যে তারা যুদ্ধ করে না। অনুচরবৃন্দ যদি লুব্ধ হয়-অর্থের দ্বারা শত্রুর বশীভূত হয়ে তারা তাকে বধ করে।

যার প্রজাপুঞ্জ (অথবা মন্ত্রীগণ) অসন্তুষ্ট যুদ্ধকালে সে পরিত্যক্ত হয়–আর যে বিষয়ভোগী তাকে জয় করা খুবই সহজ।

মন্ত্রীগণ সেই রাজাকে পছন্দ করে না যে অস্থিরচিত্ততার জন্যে উপদেশ গ্রহণে অক্ষম এবং এই অস্থিরতার জন্যেই তারা তাকে প্রয়োজনের সময়ে উপেক্ষা করে।

ধর্মের শক্তি অলঙ্ঘনীয়, তাই দেবতা এবং ব্রাহ্মণের যে নিন্দা করে সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়–আর যে ভাগ্যাহত তার অদৃষ্টেও একই পরিণাম।

দৈবই সম্পদ ও বিপদের মূল কারণ–যে দৈবনির্ভর হয়ে এই রকম ভাবতে থাকে সে নিজে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারে না।

দুর্ভিক্ষের সঙ্কট যার হয়েছে সে নিজেই শীর্ণ হতে থাকে আর নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে যার সংকটের আশঙ্কা তার আর যুদ্ধ করবার শক্তি থাকে না।

যে রাজা স্বদেশে স্থিত নয় তাকে সামান্যতম শত্রুও বধ করতে পারে, যেমন তিমি ছোট হলেও জলে বিশাল হাতিকেও টেনে নিতে পারে।

যার বহু শত্রু সে যখন বিব্রত হয়–তাকে দেখে মনে হবে সে যেন বাজপাখিবেষ্টিত এক কপোত। সে যে-পথেই অগ্রসর হোক অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যু তার অনিবার্য।

যে অকালে সেনাসমাবেশ করে অভিযান করে তাকে অনায়াসে বধ করে সেই নরপতি যে যথাকালে সুযোগ বুঝে যুদ্ধ পরিচালনা করে–যেমন রাত্রির অন্ধকারে দৃষ্টিহীন কাককে বধ করে পেচক।

যে সত্য ও ধর্মজ্ঞানহীন তার সঙ্গে সন্ধি করা অসঙ্গত, কেননা, সন্ধির ফলে বিজিত হলেও অসাধু চরিত্রের জন্যে অল্পদিনেই রূপান্তর ঘটতে পারে।

আমি এ বিষয়ে আপনাকে আরও কিছু বলব। সন্ধি, যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান, উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা, দুর্গ অথবা শক্তিমান নরপতির আশ্রয় এবং শঠতা–এই ছয়টি গুণ (উপায়)।

কর্মারম্ভের উপায় লোকবল এবং দ্রব্যবলের সংগ্রহ, স্থান ও কালের বিভাগ, সঙ্কটের প্রতিকার ব্যবস্থা এবং কার্যসিদ্ধি–মন্ত্রের এই পাঁচটি ভাগ। চারটি উপায়–সাম (শান্তি স্থাপন), দান (অর্থ বিতরণ), ভেদ (বিরোধ সৃষ্টি) এবং দণ্ডদান। উৎসাহ শক্তি (রাজার নিজের উদ্যম থেকে যে শক্তি সঞ্চিত হয়), মন্ত্রশক্তি (সুপরিচালিত মন্ত্রণা) এবং প্রভুশক্তি (সৈন্যবল ও ধনভাণ্ডার থেকে উৎপন্ন)–এই তিনটি রাজকীয় শক্তি। এই সব বিষয় সম্যক আলোচনা করে যারা অভিযান পরিচালনা করেন তারাই 'মহান' পদবাচ্য হয়ে থাকেন।

জীবনের মূল্য দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আয়ত্ত করা যায় না। রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হলেও যারা নীতিবিদ তাদের আশ্রয়ে চলে যায়। শাস্ত্রে বলে–

যার ধনসম্পদ সমভাগে বিভক্ত, যার গুপ্তচর প্রচ্ছন্ন এবং মন্ত্রণা গুপ্ত, যিনি কোন

লোকের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন না–তিনি সাগর-মেখলা পৃথিবী শাসন করবার যোগ্য।

কিন্তু যদিও মহামন্ত্রী গৃধ্র সন্ধির প্রস্তাব করেছেন কিন্তু সেই রাজা বিজয়লাভ করেছেন বলে অতিদর্পে তার প্রস্তাবে সম্মত হবে না। তা হলে এইভাবে করুন। আমাদের পরম মিত্র সিংহলদ্বীপের মহাবল নামক রাজা জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করুক।

কেননা, বিশেষ গোপনতা অবলম্বন করে, সুসংহত সৈন্যের বীর যোদ্ধা শত্রুরাজ্যে পীড়ন সৃষ্টি করবেন। শত্রু তাতে সমভাবে পীড়িত হবে। যে পীড়িত সে পীড়িতের সঙ্গেই সন্ধি করতে আগ্রহী হয়।

রাজা বললেন–তাই হোক। এই বলে তিনি বিচিত্র নামক এক বককে গোপন পত্র দিয়ে পাঠালেন সিংহলদ্বীপে।

গুপ্তচর এসে বলল–মহারাজ, সেখানকার সংবাদ শুনুন। গৃধ্র এই কথা বলেছেন–মেঘবর্ণ সেখানে অনেক দিন বাস করেছে, সুতরাং সে-ই জানে, রাজা হিরণ্যগর্ভের এমন গুণ আছে কিনা যাতে তার সঙ্গে সন্ধি করা যেতে পারে।

রাজা চিত্রবর্ণ মেঘবর্ণকে ডেকে পাঠালেন। তাকে প্রশ্ন করলেন–ওহে কাক, হিরণ্যগর্ভ কী রকম লোক? তার মন্ত্রী চক্রবাকই বা কেমন? কাক বলল, মহারাজ, হিরণ্যগর্ভ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতোই মহান; চক্রবাকের মতো মন্ত্রী কোথাও দেখা যায় না। রাজা বললেন, তা যদি হয়, তুমি তার সঙ্গে প্রতারণা করলে কেন?

একটু হেসে মেঘবর্ণ বলল–মহারাজ, যারা বিশ্বাস করেছে তাদের বঞ্চনা করায় কী কৃতিত্ব আছে? অঙ্কে আরোহণ করে যে ঘুমিয়ে আছে তাকে বধ করায় কোন্ পৌরুষ প্রকাশিত হয়?

শুনুন মহারাজ। মন্ত্রী আমাকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন–কিন্তু রাজার হৃদয় উদার, তাই তাকে প্রতারণা করতে পেরেছি। শাস্ত্রে বলেছে–নিজের মতো ভেবে দুর্জনকে যে সত্যবাদী বলে জানে সে সহজেই বঞ্চিত হয়–ঠিক যেমন সেই ব্রাহ্মণ ছাগের ব্যাপারে বঞ্চিত হয়েছিল শঠের কথায়।

রাজা বললেন–সে আবার কী?

কাক বলতে লাগল–

কথা ॥ নয়

গৌতমারণ্যে এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। কোন এক গ্রামে একটি ছাগল কিনে তিনি যখন কাঁধে নিয়ে ফিরে আসছিলেন–তখন তিন ধূর্ত তাকে দেখতে পেল। তারা ভাবল, যদি এই ছাগল কোন উপায়ে বাগানো যায় তবে বুদ্ধির বেশ একটা খেলা দেখা যাবে–এই ভেবে তারা দু'মাইল দূরে দূরে পথে তিনটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল সেই ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষায়। তারপর সেই ব্রাহ্মণ এসে চলে যাচ্ছেন দেখে প্রথম ধূর্ত মন্তব্য করল–এ কী! ব্রাহ্মণ, আপনি কাঁধে কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন যে!

ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন–যজ্ঞের জন্যে ছাগল নিয়ে যাচ্ছি, কুকুর হতে যাবে কেন?

পরবর্তী ধূর্ত ঐ একই কথা বলল। তার কথা শুনে ব্রাহ্মণ ছাগলটিকে মাটিতে রেখে বার বার দেখে পরীক্ষা করলেন; তারপর আবার কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন।

কিন্তু তখন চিত্ত তাঁর দোলায়মান হয়ে উঠেছে। কেননা–

সৎলোকের চিত্তও খলের বচনে দোলায়িত হয় ; যে এই ধরনের কথা শুনে বিশ্বাস করে সে চিত্রকর্ণ নামক উটের মতোই মৃত্যুবরণ করে।

রাজা প্রশ্ন করলেন–সে আবার কী ?

মন্ত্রী বলতে লাগলেন–

কথা ॥ দশ

কোন এক বনের এক অংশে সিংহ থাকত–তার তিন ভৃত্য–কাক, বাঘ আর শিয়াল। একদিন তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেল এক যূথভ্রষ্ট উটকে। তারা প্রশ্ন করল–সে কোথা থেকে এসেছে। সে নিজের বিবরণ খুলে বলল। তখন তারা ওকে নিয়ে সিংহের কাছে সমর্পণ করল। সিংহ তাকে জীবনের আশ্বাস দিয়ে–তার নাম রাখল চিত্রকর্ণ, আর তাকে অনুরোধ জানালো–তার সঙ্গে থাকতে। তারপর–

একদিন সিংহের শরীর ভাল ছিলো না–তাছাড়া ভীষণ বর্ষার ফলে খাদ্যেরও অভাব দেখা দিল। তারা বেশ বিপন্ন হয়ে পড়ল। তারা ভাবতে লাগল–একটা কিছু করা হোক যাতে সিংহ এই উটকে বধ করেন। এই তৃণভোজী পশুটাকে রেখে লাভ কী ? বাঘ বলল–প্রভু তাকে অভয় দিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন–কীভাবে তা সম্ভব ? কাক জবাব দিল–এখন সিংহ অনাহারে শীর্ণ–ক্ষুধার তাড়নাতে সে পাপ কাজ করবে। কেননা–

স্ত্রীলোক ক্ষুধার্ত হলে তার পুত্রকে পর্যন্ত ত্যাগ করে ; ক্ষুধার্ত সর্পী নিজের ডিমও খেয়ে ফেলে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অকরণীয় কোন্ পাপ কাজ আছে ? যে (ক্ষুধায়) দুর্বল হয়ে পড়েছে তার দয়ামায়া কিছু থাকে না। তাছাড়া–

মত্ত, প্রমত্ত, শান্ত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, ভীরু, ত্বরাযুক্ত–এরা কখনও ধর্মবিদ্ হতে পারে না। এই ভেবে তারা সকলে সিংহের কাছে গেল।

সিংহ প্রশ্ন করল–কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে পেরেছ কী ?

তারা বলল–চেষ্টা করেও কিছু সংগ্রহ করতে পারি নি।

সিংহ বলল–তাহলে কিভাবে আমাদের জীবন রক্ষা হবে ?

কাক বলল–মহারাজ, আপনি হাতের কাছের খাদ্য গ্রহণ করছেন না, তাই আমাদের এই সংকট উপস্থিত।

সিংহ প্রশ্ন করল–হাতের কাছে আবার কোন্ খাদ্য দেখলে ? কাক তার কানে কানে বলল–চিত্রকর্ণ। সিংহ শুনেই ভূমি স্পর্শ করে কানে হাত দিল। সে বলল–আমিও তাকে অভয় দিয়েছি, কী করে এটি সম্ভব ? কারণ–

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অভয়প্রদানকে শ্রেষ্ঠ দান হিসেবে বর্ণনা করেন–তেমন করে তারা বলেন না ভূমিদান, স্বর্ণদান, গোদান বা অন্নদান সম্পর্কে। তাছাড়া–

শরণাগতকে যদি উত্তমরূপে রক্ষা করা যায় তাহলে মানুষ সর্বকামনার সিদ্ধিস্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে।

কাক বলল–আপনাকে বধ করতে হবে না। আমরাই এমন অবস্থার সৃষ্টি করব যাতে সে নিজেই নিজের দেহ দান করতে ইচ্ছুক হয়। সিংহ এই কথা শুনে নীরব হয়ে রইল।

সুযোগ পেয়ে কাক এক কূট কৌশল স্থির করে নিল এবং সকলকে নিয়ে সিংহের কাছে গেল।

কাক বলল—মহারাজ, বহু যত্নে সন্ধান করেও আমরা খাদ্য পেলাম না। আপনি অনেক দিন উপবাস করে দুর্বল হয়ে পড়েছেন—আমি বলি আপনি আমাকে ভোজন করুন।

কেননা, স্বামীই (রাজা) সকল প্রকৃতির মূল। বৃক্ষের যদি মূল বর্তমান থাকে তবেই মানুষের পক্ষে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা সফল হয়।

সিংহ বলল—সখে, এ রকম কাজে প্রবৃত্তি হওয়ার চেয়ে মরণও ভালো।

শিয়ালও একই কথা বলল। সিংহ তার উত্তরে বলল—না, তা হতে পারে না। তখন বাঘ বলল—প্রভু, আমার দেহ ভোজন করে আপনি বেঁচে থাকুন। সিংহ জবাব দিল—না তা সম্ভব নয়।

ততক্ষণে চিত্রকর্ণের এই বিশ্বাস হয়েছে যে সে প্রস্তাব করলেও প্রভু সম্মত হবেন না। তখন সে-ও নিজের দেহ দান করতে চাইল—কিন্তু সে প্রস্তাব করতে না করতেই বাঘ তার উদর বিদীর্ণ করে তাকে বধ করল।

সকলের ভোজন পর্ব সমাধা হল।

এই জন্যেই আমি বলছিলাম—দুষ্ট লোকের উক্তিতে সৎলোকেরও চিত্ত দোলায়িত হয়—। তারপর তৃতীয় ধূর্তের একই কথা শুনে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত করল তার নিজেরই মতিভ্রম হয়েছে। তখন সে ছাগল ফেলে দিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে গেল।

ছাগল নিয়ে গেল তিন ধূর্তের দল—তারপর খেয়ে ফেলল।

তাই বলছিলাম—নিজের মতো ভেবে যদি দুর্জনকেও সত্যবাদী বলে মনে করি তবে এই ব্রাহ্মণের মতো প্রতারিত হতে হবে।

রাজা বললেন—মেঘবর্ণ, তুমি কীভাবে এত কাল শত্রুর মধ্যে বাস করেছ, কীভাবেই বা তাদের মন জয় করেছ? মেঘবর্ণ উত্তর দিল—নিজের স্বার্থসিদ্ধিই হোক অথবা প্রভুর প্রয়োজনসাধনেই হোক লোকে কী না করতে পারে দেখুন—

লোকে জ্বালাবার জন্যেই মাথায় ইন্ধন বহন করে—নদীর জলপ্রবাহ বৃক্ষমূল ধৌত করার ছলেই তার ক্ষয় সাধন করে। শাস্ত্রে বলে—

বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের কার্যসাধনের জন্যে শত্রুকেও স্কন্ধে বহন করে এবং তা করতে গিয়েই মণ্ডূকদের ধ্বংস করেছিল এক বৃদ্ধ সর্প।

রাজা বলল—এটি আবার কী বললে?

মেঘবর্ণ বলতে লাগল—

কথা ॥ এগারো

জীর্ণোদ্যানে (একটি পুরোনো বাগানে) এক সাপ বাস করত—নাম মন্দবিষ। অত্যন্ত বার্ধক্যহেতু সে আহারের সন্ধানেও যেতে পারত না—এই অবস্থায় একদিন সে এক সরোবরের তীরে শুয়ে ছিল। দূর থেকেই একটি ব্যাঙ তাকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—কী ব্যাপার, খাদ্যের খোঁজে বেরোন নি?

সাপ বলল—তোমার পথে তুমি যাও বন্ধু। আমার মতো অভাগাকে আর প্রশ্ন করে কী হবে?

ব্যাঙের কৌতূহল হল। সে জেদ করল—সব কথা আপনাকে বলতেই হবে।

সাপ বলল—ব্রহ্মপুরবাসী সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য—তার ছেলেকে আমি দংশন করেছিলাম। ছেলেটার বয়স বিশ বছরের মতো হবে—সকল গুণে গুণী; তার নাম সুশীল। সুশীল মরে গেছে দেখে কৌণ্ডিন্য মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। ব্রহ্মপুরবাসী তার আত্মীয়-পরিজন সেখানে এসে বসলেন।

কেননা, উৎসবে, সংকটে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যে পাশে এসে দাঁড়ায় সে-ই তো যথার্থ বন্ধু!

এদের মধ্যেই একজনের নাম কপিল—বেদবিদ্যা তার সমাপ্ত হয়েছে। তিনি বললেন—কৌণ্ডিন্য, তুমি নির্বোধ তাই এভাবে বিলাপ করছ। শোন, কেউ জন্মগ্রহণ করার পর প্রথমেই ধাত্রীর মতো তাকে কোলে তুলে নেয় 'অনিত্যতা,' মাতা কোলে নেন তারপরে, সুতরাং এখানে শোকের অবসর কোথায়?

কোথায় আজ সেই পৃথিবীর অধিপতিগণ, কোথায় তাদের সৈন্যবাহিনী, দেহরক্ষক আর হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহন? তাদের বিচ্ছেদ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে পৃথিবী এখনো বর্তমান।

আরও দেখ,—এই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে বিনাশ। সম্পদ বিপদেরই আশ্রয়, মিলন বিচ্ছেদের সঙ্গেই একসূত্রে বাঁধা। আর যার সৃষ্টি হয়, তার ধ্বংসও আছে।

প্রতি মুহূর্তেই দেহের ক্ষয় হয়, কেউ তা বোঝে না, কিন্তু ধ্বংস হলেই বোঝে—যেমন কাঁচা মাটির পাত্র জলে রাখলে কেবলমাত্র গলে গেলেই বোঝা যায়।

প্রত্যেক দিনই মৃত্যু মানুষের নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে, যেমন বধ্যভূমিতে নেওয়ার সময় দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি পদক্ষেপেই মৃত্যু নিকটতর হতে থাকে।

যৌবন, রূপ, জীবন, সঞ্চিত অর্থ, সম্পদ ও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন—সবই ক্ষণস্থায়ী। পণ্ডিত ব্যক্তি এ সকলের দ্বারা মুগ্ধ হন না।

যেমন দুটি কাষ্ঠখণ্ড মহাসাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে একত্র মিলিত হয়, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তেমনি (এই সংসারে) প্রাণীতে প্রাণীতে মিলন (অর্থাৎ তারা বিচ্ছিন্ন হবার জন্যেই মিলিত হয়ে থাকে)।

যেমন কোন পথিক পথ চলতে চলতে ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার পথ চলতে থাকে—তেমন এই সংসারে প্রাণীদের মধ্যে মিলন। তাছাড়া—

পঞ্চভূতে নির্মিত দেহ যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপাদান যখন তার মূল আশ্রয়টিকেই ফিরে পায় তখন আর শোকের কারণ কী থাকতে পারে?

যত বিচিত্র প্রিয়সম্পর্ক মানুষ নির্মাণ করে চলে ততগুলি শোকশল্যই তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকে।

নিজের দেহের সঙ্গেই চিরকালের সহবসতি যদি সম্ভব না হয় তবে অন্য কারও সঙ্গে তা সম্ভব হবে কী করে?

আরও দেখ—মিলন বিচ্ছেদেরই সম্ভাবনা সূচিত করে—তেমনি অনিবার্য মৃত্যুকে সম্ভাবিত করে জন্ম।

প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন প্রথম দিকেই সুখকর বলে মনে হয়, কিন্তু অখাদ্য ভোজনের মতোই তা পরিণামে ভয়ঙ্কর।

নদীর স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে—তা আর ফিরে আসে না; তেমনি রাত্রি এবং

দিন মানুষের আয়ু নিয়ে চলে যাচ্ছে।

একমাত্র সজ্জনের সঙ্গে সমাগম এই সংসারে সুখদায়ক, কিন্তু তারও পরিণাম বিচ্ছেদ—তাই একে দুঃখরাশির পুরোভাগে স্থাপন করা হয়।

এই কারণেই সাধু ব্যক্তিগণ সজ্জনের সঙ্গে মিলন কামনা করেন না, কেননা বিচ্ছেদের অসিতে ক্ষতবিক্ষত মনের কোন ঔষধ নেই।

সগর প্রভৃতি নৃপগণের কৃতকর্ম—পুণ্যকর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের কীর্তি এবং তাঁরাও আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত।

মৃত্যু কঠিন দণ্ড বিধান করে থাকে ; এই মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরও সমস্ত কর্মচেষ্টা শিথিল হয়ে যায়—যেমন শিথিল হয়ে যায় বর্ষার-জলে-সিক্ত চামড়ার বন্ধন (সেই বন্ধনে আর জোর থাকে না)।

হে নরশ্রেষ্ঠ ! প্রথম যে রাত্রিতে মানুষ গর্ভবাস করতে আসে—সেই রাত্রি থেকেই অস্খলিত গতিতে সে মৃত্যুর সমীপস্থ হতে থাকে।

এই কারণে যারা এই সাংসারিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যদৃষ্টি গ্রহণ করতে পারে তাদের কাছে মৃত্যুজনিত এই বিচ্ছেদশোক অজ্ঞানজ। দেখ—

অজ্ঞান যদি কারণ না হয় তবে নিশ্চয়ই বিচ্ছেদই এর কারণ ; তাহলে দিন যতই যেতে থাকবে—শোকের দুঃখ তো বাড়বে, দুঃখ কমে যাবে কেন ?

সুতরাং, সখে, তুমি আত্মানুসন্ধান কর, শোকচর্চা ত্যাগ কর। কেননা—

যে সব আঘাত অতর্কিতে উপস্থিত হয়, যে সব আঘাত নবীন এবং মর্মভেদী—তাদের সম্পর্কে চিন্তা না করাই এক মহৌষধ।

তখন তার কথা শুনে কৌণ্ডিন্য উঠে বললেন—গৃহ আমার কাছে নরকতুল্য, এখানে থেকে আর কাজ নেই ; আমি বনেই যাব।

কপিল আবার বললেন—

যারা আসক্তচিত্ত, বনেও তাদের অনেক দুঃখ। গৃহে থেকেও যদি পঞ্চেন্দ্রিয় সংযত করা যায়, তবে তাই হবে তপস্যা। গৃহে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে যে অনিন্দনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় তার কাছে গৃহই তো তপোবন।

শোকার্ত ব্যক্তিও যে কোন আশ্রমেই থাকুন না, সকল প্রাণীর প্রতি সমান আচরণ করে তিনিও ধর্মপালন করতে পারেন। বাইরের চিহ্ন ধর্মাচরণের প্রমাণ হতে পারে না।

জীবনধারণের জন্যেই যারা ভোজন করেন, সন্তানের কামনাতেই যারা বিবাহ করেন, সত্যভাষণের জন্যেই যাদের বাক্‌শক্তি তারা সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করতে পারেন।

আরও দেখ—আত্মা নদীস্বরূপ—সংযম তার পুণ্য সোপান, সত্য তার বারিরাশি, সদাচরণ তার দুই তীর, করুণা তার তরঙ্গ। হে পাণ্ডুপুত্র ! এই নদীতে তুমি অবগাহন কর, সাধারণ জলে আত্মার শোধন হয় না। বিশেষত—

যে সাংসারিক জীবন জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির যন্ত্রণায় পীড়িত—অত্যন্ত অসার সেই জীবনকে যিনি ত্যাগ করতে পারেন, তিনিই সুখী। কারণ—

দুঃখই সংসারে বাস্তব, সুখ নয়, যেহেতু তাই প্রত্যক্ষ দেখা যায়। দুঃখার্তের প্রতিকারে সুখের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়ে থাকে। (অর্থাৎ অন্যের দুঃখ দূর করাই একমাত্র সুখ)।

কৌণ্ডিন্য বললেন—তাই বটে।

তারপর সেই শোকার্ত ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে তুমি ভেকের

বাহন হবে। কপিল বললেন—এখন তুমি শোকার্ত, উপদেশ শোনবার মতো মনের অবস্থা তোমার নেই। তবু এখন যা করা উচিত তা শোন।

আসঙ্গলিপ্সা সর্বথা বর্জনীয়; যদি বর্জন না করা যায় তবে সৎলোকের সঙ্গ করাই উচিত। সৎসঙ্গই (আসক্তি রোগের) ঔষধ।

কামনা-বর্জন সর্বথা করণীয়, যদি কামনা ত্যাগ সম্ভব না হয় তবে কামনা থাকুক একমাত্র মুক্তিলাভের জন্যে, কেননা অন্য সব কামনা ত্যাগের এই হল পথ।

কপিলের উপদেশামৃতধারায় কৌণ্ডিন্যের শোকানল প্রশান্ত হল—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। আর আমি ব্রাহ্মণের অভিশাপে এইখানে পড়ে আছি—ভেকদের বহন করাই আমার কাজ।

তারপর ভেক চলে গেল ভেকরাজের কাছে—জালপাদ তার নাম। তার কাছে গিয়ে সে সব কথা জানালো। সব শুনে ভেকরাজ নিজেই চলে এলেন এবং সাপের পিঠে উঠে বসলেন। সাপও তাকে পিঠে নিয়ে সুন্দর গতিতে চলতে লাগল।

পরদিন দেখা গেল সে চলতে পারছে না। ভেকরাজ প্রশ্ন করল—আজ গতি এমন শিথিল হল যে। সাপ বলল—প্রভু, খাদ্যের অভাবে দুর্বল, তাই চলতে অক্ষম। ভেকরাজ বললেন—আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি ভেকদের ভোজন কর। সাপ বলল—এ তো মহান অনুগ্রহ। আমি গ্রহণ করলাম—

ভেকভক্ষণ শুরু হল ক্রমে ক্রমে। সেই জলাশয় ভেকহীন হল, তখন সেই সাপ ভেকরাজকেও খেয়ে ফেলল। মেঘবর্ণ বলল—তাই বলছিলাম, প্রয়োজন হলে শত্রুকেও স্কন্ধে বহন করতে হয়—সে কথা থাক, পুরাতন কাহিনী বর্ণনায় কাজ নেই। এই রাজা হিরণ্যগর্ভ সকল দিক দিয়েই সন্ধির যোগ্য—এর সঙ্গে সন্ধি করা হোক, এই আমার অভিমত।

রাজা বললেন—এ আবার কী ধরনের বিচার? তাকে আমরা যুদ্ধে জয় করেছি; আমাদের সেবকরূপে থাকতে চায় ভালো, নইলে আবার যুদ্ধ হবে।

এই সময়ে জম্বুদ্বীপ থেকে ফিরে এসে শুক জানালো—সিংহলের রাজা সারস জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করে সেইখানেই অবস্থান করছেন। রাজা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—কী বললে? শুক তার কথার পুনরাবৃত্তি করল। গৃধ্র নিজের মনে মনেই বলে উঠলেন—সাধু চক্রবাক, সাধু সর্বজ্ঞ। চমৎকার। রাজা সক্রোধে বলে উঠলেন—আচ্ছা, অবস্থান করতে দাও। আমি গিয়ে সমূলে তাকে উন্মূলিত করছি।

দূরদর্শী হেসে বললেন—শরতের মেঘের মতো অনর্থক গর্জন করা অসঙ্গত। পণ্ডিত ব্যক্তি তার ইষ্টানিষ্ট পরের কাছে ব্যক্ত করেন না। তাছাড়া—

একই সঙ্গে বহু আক্রমণকারীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও অসমীচীন। বিষধর সর্পও বহু কীটের আক্রমণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রভু, সন্ধি না করে এখান থেকে যাব কেন? কারণ সেক্ষেত্রে হিরণ্যগর্ভ আমাদের চলে যাবার পর আবার আক্রমণ করতে পারে। আরও দেখুন—

পূর্ণ সত্য না জেনে যে ক্রোধের বশীভূত হয়—মূঢ় ব্রাহ্মণ তার নকুলের ব্যাপারে যেমন অনুতপ্ত হয়েছিলেন—তাকেও তেমনি অনুতাপ করতে হয়।

রাজা বললেন—সে কী?

দূরদর্শী বলতে লাগলেন—

উজ্জয়িনীতে মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার ব্রাহ্মণী এক সন্তান প্রসব করেছিলেন। শিশু সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে ব্রাহ্মণকে রেখে ব্রাহ্মণী গিয়েছিলেন স্নান করতে; এরই মধ্যে রাজার কাছ থেকে আমন্ত্রণ এলো পার্বণশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাজার দান গ্রহণ করতে। ব্রাহ্মণ স্বভাবতই দরিদ্র ছিলেন—তিনি ভাবলেন, যদি তাড়াতাড়ি না যাই অন্য কেউ এসে সেই দান গ্রহণ করবে। কেননা—

যা আদায় করতে হবে, যা দিতে হবে, যে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে—তা যদি তাড়াতাড়ি না করা যায় তাহলে কাল এদের রস শুষে নেয়।

কিন্তু শিশুটিকে দেখবার তো কেউ নেই। যাই হোক আমি এই নকুলকে তো পুত্রের মতোই পালন করেছি—এই নকুলকে রেখেই আমি যাই।

সেই ব্যবস্থা করেই তিনি চলে গেলেন।

এদিকে নকুল দেখল একটি কেউটে সাপ শিশুর দিকে আসছে। সে ছুটে গিয়ে তাকে মেরে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। তারপর ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে সে ছুটে গিয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল—তার মুখ ও পা তখন রক্তে লিপ্ত। তাকে সেই অবস্থায় দেখে ব্রাহ্মণ ভাবলেন—এ নিশ্চয়ই আমার ছেলেটিকে খেয়েছে। এই সিদ্ধান্ত করে তিনি নকুলকে বধ করলেন। কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ দেখলেন শিশু নিরাপদে ঘুমিয়ে আছে—নিহত সাপটিও কাছেই পড়ে আছে।

তখন নকুল যে উপকারক তা জেনে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাই বলছিলাম—যিনি সমস্ত তথ্য না জেনে ক্রোধের বশীভূত হন, তাকে অনুতাপ করতে হয়। আরও দেখুন—

কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, অভিমান ও ঔদ্ধত্য—এই ছয় দোষের সমষ্টি পরিহার করা উচিত; এইগুলি ত্যাগ করলেই লোকে সুখী হয়।

রাজা বললেন—এই কি আপনার সিদ্ধান্ত? মন্ত্রী বললেন—হ্যাঁ, এই আমার দৃঢ় মত। কেননা, গুরুতর বিষয়ের স্মৃতি, সুচতুর অনুমান, নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মন্ত্রগুপ্তি—এইগুলি হল মন্ত্রীর গুণ। তাছাড়া—

সহসা কোন কাজ করা সঙ্গত নয়—বিচারের অভাবই সকল দুর্ভাগ্যের আশ্রয়। যিনি ভেবেচিন্তে কাজ করেন, সম্পদলক্ষ্মী তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকেই বরণ করেন।

সুতরাং মহারাজ, আমার পরামর্শ মতো যদি চলতে চান তবে সন্ধি করেই আপনার যাওয়া উচিত। কারণ—

সাধ্য বস্তুর সাধনের জন্যে যদিও চারটি উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে—(সন্ধি, বিগ্রহ, যান ও আসন), তিনটির প্রয়োজন শুধু সংখ্যাপূরণের জন্যে, আসল সিদ্ধি রয়েছে সন্ধিস্থাপনে।

রাজা বললেন—এখন সন্ধিস্থাপন কীভাবে সম্ভব?

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা সম্ভব। কেননা—

অজ্ঞ ব্যক্তিকে সহজেই সন্তুষ্ট করা যায়, আরও সহজে সন্তুষ্ট করা যায় বিশেষজ্ঞকে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার সামান্য জ্ঞান নিয়েই গর্বিত তাকে খুশি করতে স্বয়ং ব্রহ্মাও পারেন না।

বিশেষত এই রাজা ধর্মজ্ঞ এবং তার মন্ত্রীও সর্বজ্ঞ; মেঘবর্ণের কথায় এবং তাদের কাজে আমি তা জানতে পেরেছি। কারণ—

যারা সামনে উপস্থিত নেই অর্থাৎ যারা অপ্রত্যক্ষ তাদের গুণ ও প্রবৃত্তি তাদের অনুষ্ঠিত কর্ম থেকেই অনুমান করে নিতে হয় ; কিন্তু যাদের কর্মও অপ্রত্যক্ষ তাদের অর্জিত ফল থেকে তা অনুমান করা সম্ভব।

রাজা বললেন—আর আলোচনার দরকার নেই। আপনি যে নীতি অনুমোদন করলেন—তা-ই অনুসরণ করুন।

এই কথার পর মহামন্ত্রী বললেন—বেশ, এক্ষেত্রে যা করা সঙ্গত আমি তা করব। এই বলে তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

এদিকে যে বককে দূত রূপে পাঠানো হয়েছিল সে এসে হিরণ্যগর্ভকে বলল—মহারাজ! সন্ধি স্থাপন করতে মহামন্ত্রী গৃধ্র আমাদের কাছে আসছেন। রাজহংস জবাব দিলেন—শত্রুর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন কেউ হয়তো আসতে পারে।

সর্বজ্ঞ হেসে বললেন—এ ব্যাপারে শংকার কোনো কারণ নেই। কারণ, ইনি মহামন্ত্রী দূরদর্শী—অথবা এই হল দুর্বলমতিদের ধরন ; কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের একেবারেই সন্দেহ থাকে না, আবার অন্য ক্ষেত্রে তাদের পদে পদে সন্দেহ।

রাত্রির সরোবরে পদ্মের মৃণাল খুঁজে বেড়াচ্ছে যে হাঁস সে বুঝে উঠছে না কোনগুলি মৃণাল, কেননা সে কয়েকবার বঞ্চিত হয়েছে জলে নক্ষত্রের ছায়া দেখে ; দিনের বেলাও সে মৃণাল ভক্ষণ করে না—ভাবে এ বুঝি নক্ষত্র। যে একবার প্রতারণায় ঠকেছে সে সত্যেও অমঙ্গল আশঙ্কা করে।

কুলোকের দ্বারা যার মন দূষিত হয়েছে, সজ্জনের প্রতি সে বিশ্বাস হারায়। গরম পায়সে যে বালকের ঠোঁট পুড়েছে সে দধিও ফুৎকারে শীতল করে খায়।

মহারাজ, ওকে অভ্যর্থনার জন্যে সাধ্যমতো রত্নোপহার প্রভৃতি প্রস্তুত রাখুন।

সেইভাবেই সব আয়োজন করা হল। দুর্গদ্বার থেকে এগিয়ে এসে চক্রবাক গৃধ্রকে সমাদরে গ্রহণ করে তাকে রাজদর্শন করালো। তারপর তিনি প্রদত্ত আসন গ্রহণ করার পর চক্রবাক বললেন—এখানে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রভু আপনি। আপনি ইচ্ছামতো ভোগ করুন।

দূরদর্শী বললেন—সবই ঠিক। কিন্তু বর্তমানে পল্লবিত দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ—

লুব্ধ ব্যক্তিকে জয় করতে হবে অর্থের দ্বারা, উদ্ধত ব্যক্তিকে কৃতাঞ্জলি দ্বারা, মূর্খ ব্যক্তিকে তার খুশির অনুবর্তন করে, আর পণ্ডিতকে সত্যের দ্বারা।

বন্ধুকে বশ করতে হবে আন্তরিকতার দ্বারা, তার আত্মীয়পরিজনকে অভ্যর্থনার দ্বারা, তার স্ত্রী ও ভৃত্যকে দান ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা, অন্য লোকদের বিনয়ের দ্বারা।

এখন এই মহাশক্তিশালী রাজা চিত্রবর্ণের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তাকে বিদায় দিন। চক্রবাক বললেন—কীভাবে সন্ধি করতে হবে তা-ও বলুন। রাজহংস বললেন—কত প্রকারে সন্ধি সম্ভব? গৃধ্র বলল—বলছি, শুনুন।

কোনো রাজা তাঁর চেয়েও অধিক বলবান শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যখন বিপন্ন বোধ করেন, যখন তাঁর আর কোনো উপায় থাকে না, তখন তিনি সন্ধির প্রস্তাব করবেন—এতে তিনি কিছু সময় পাবেন।

ষোল রকম সন্ধি আছে—কপাল, উপহার, সন্তান, সঙ্গত, উপন্যাস, প্রতিকার, সংযোগ, পুরুষান্তর, অদৃষ্টনর, আদিষ্ট, আত্মাদিষ্ট, উপগ্রহ, পরিক্রয়, উচ্ছিন্ন, পরভূষণ এবং

স্কন্ধোপনেয়। যাঁরা সন্ধিবিষয়ে বিচক্ষণ তাঁরা এই ষোল প্রকার সন্ধির কথাই বলে থাকেন।

শক্তির দিক দিয়ে সমান অথবা সমান চুক্তির ভিত্তিতে যে-সন্ধি সম্পাদিত হয় তার নাম 'কপাল সন্ধি'। যখন কোন একটি পক্ষ অপর পক্ষকে দানের দ্বারা প্রসন্ন করে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তার নাম 'উপহার সন্ধি'।

'সন্তান সন্ধি' তাকেই বলে যেখানে একটি কন্যা দান করা হয়; দুই সৎপক্ষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনপূর্বক যে সন্ধি তার নাম 'সঙ্গত'।

এই 'সঙ্গত' সন্ধি যাবজ্জীবন স্থায়ী হয় এবং এতে দুই পক্ষেরই স্বার্থ রক্ষিত হয়। এই সন্ধি কোন সম্পদঘটিত দুর্ঘটনায় বা দুর্দিনে ভাঙে না।

এর গৌরবের আধিক্যের জন্যেই একে সন্ধিবিশেষজ্ঞগণ স্বর্ণের সঙ্গে উপমিত করে থাকেন। অন্য সন্ধিকুশল ব্যক্তিগণও একে বলেন 'কাঞ্চন'।

নিজের কার্যসিদ্ধির কথা ভেবে যে সন্ধি স্থাপন করা হয় তাকে, শত্রুর সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তারা বলেন 'উপন্যাস'।

আমি আগে এর উপকার করেছি—বিনিময়ে ইনিও করবেন—এই ভাবনায় যে সন্ধি করা হয় তার নাম 'প্রতিকার'।

আমি এর উপকার করব, ইনিও নিশ্চয়ই তার বিনিময়ে কোন উপকার করবেন—এই আশায় যে সন্ধি অনুষ্ঠিত হয় তাকেও 'প্রতিকার' বলা হয়ে থাকে—রাম ও সুগ্রীবের ক্ষেত্রে এই সন্ধিই হয়েছিল।

'সংযোগ' সন্ধি বলা হয় তাকে যেখানে দুই পক্ষের লক্ষ্য এক—এতে দুই পক্ষেরই বিধিগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

যে সন্ধিতে দুই পক্ষ থেকেই এই পণ করা হয়—আমাদের প্রধান যোদ্ধারা আমাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলবেন—তাকে বলা হয় 'পুরুষান্তর'।

যে সন্ধিতে শত্রুপক্ষ এই চুক্তি করেন—তুমি একাই আমার প্রয়োজন সাধন করবে, সেই সন্ধিকে বলে 'অদৃষ্ট পুরুষ'।

সন্ধি-বিষয়ে যারা নিপুণ তারা বলেন, জয়ী পক্ষ যদি এমন সন্ধি করেন যার ফলে অন্য পক্ষের অধিকৃত ভূভাগ তার অধিকারে চলে আসে তবে সেই সন্ধি হবে 'আদিষ্ট'।

নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সন্ধির নাম 'আত্মাদিষ্ট'; যখন শত্রুর হাতে সমস্ত কিছু সমর্পণ করেও জীবন রক্ষা করা হয়—তখন সেই সন্ধিকে বলে 'উপগ্রহ'।

রাজকোষের অংশ, অর্ধেক, এমনি অন্য সম্পদ রক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ কোষের বিনিময়ে অবশিষ্ট সম্পদের রক্ষার জন্যে যে সন্ধি স্থাপন তাকে বলে 'পরিক্রয়'।

যে সন্ধিতে মূল্যবান জমিগুলি অন্য পক্ষের কবলিত করা হয়—তার নাম 'উচ্ছন্ন'; যখন জমির ফসলের সর্বাংশ দিতে হয়—সেই সন্ধির নাম 'পরভূষণ'।

যে সন্ধিতে ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয় যার ভার স্কন্ধে বহনযোগ্য—সেই সন্ধির নাম 'স্কন্ধোপনেয়'।

যে সন্ধিতে পারস্পরিক বাধ্যতা থাকে (প্রতিকার), বা পরস্পরের মৈত্রীভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত (সঙ্গত), আত্মীয়তা যে সন্ধির ভিত্তি (সন্তান) এবং দানের দ্বারা যে সন্ধি স্থাপিত (উপহার)—এই চারটিই সন্ধির প্রধান ভেদ।

অথবা আমার মতে 'উপহার'-ই একমাত্র সন্ধি, অন্য সন্ধিতে মৈত্রীভাব নেই।

এই সন্ধিতে জয়ী পক্ষ কিছু না নিয়ে ফিরে যান। না আমার তো মনে হয় 'উপহার'

ছাড়া কোন সন্ধিই নেই।

চক্রবাক বললেন—শুনুন ;

এই ব্যক্তি আমার আত্মীয়, এই ব্যক্তি আমার শত্রু—যারা লঘুচিত্ত তারাই এভাবে বিচার করে থাকেন। যারা উদারচরিত্র তাদের কাছে বিশ্বভুবনই আত্মীয়ের মতো। তাছাড়া—

যিনি যথার্থ পণ্ডিত তিনি অন্যের স্ত্রীকে মায়ের মতো, পরের ধনকে দেখেন মৃৎখণ্ডের মতো আর সমস্ত প্রাণীকেই দেখেন নিজের মতো।

রাজা বললেন—আপনি মহান এবং সুপণ্ডিত। এখন আমাদের কী করণীয় সে বিষয়ে উপদেশ দিন।

মন্ত্রী বললেন—আর কেন আমাকে এ প্রশ্ন করছেন ? আধিব্যাধিতে উৎপীড়িত যে দেহ আজ বা কাল বিনষ্ট হবেই সেই দেহের স্বার্থে কে আর অধর্ম আচরণ করবে।

জলে পতিত চন্দ্রের ছায়ার মতোই প্রাণীদের জীবন চঞ্চল। জীবনকে এ ভাবে জেনে সকলেরই মঙ্গল আচরণ করা উচিত।

সংসার মরীচিকার মতোই মিথ্যা—এ কথা জেনে সজ্জনের সঙ্গ করা উচিত—প্রথম লক্ষ্য ধর্মোপার্জন, দ্বিতীয় লক্ষ্য—সুখভোগ।

সুতরাং আমার মতে তাই (সজ্জনের সঙ্গ) করা উচিত। কারণ—সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সত্য যদি ওজন করা হয় তবে সত্যের ওজন বেশি ভারী হবে।

সুতরাং দুই রাজার মধ্যে 'কাঞ্চন'-নামক সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হোক—এই সন্ধিতে সত্যই প্রধান বন্ধন।

সর্বজ্ঞ বলেন—তাই হোক। মন্ত্রী দূরদর্শী রাজহংস দ্বারা বস্ত্রালংকারে পূজিত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি এর পর চক্রবাকের সঙ্গে চিত্রবর্ণের নিকটে উপস্থিত হলেন। গৃধ্রের বচন অনুযায়ী তিনি প্রচুর সম্মান দেখিয়ে সর্বজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করলেন। সর্বজ্ঞকে বিভিন্ন উপহারে সম্মানিত করা হল। সর্বজ্ঞ সন্ধির প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন—তারপর তাকে পাঠানো হল রাজহংসের কাছে।

দূরদর্শী বললেন—মহারাজ ! আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এখন চলুন বিন্ধ্যাচলে আমাদের রাজ্যে আমরা ফিরে যাই। তারপর সবাই ফিরে গেল দেশে—ঈপ্সিত লাভে সবাই আনন্দে মগ্ন হল।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—বল, আর কী তোমাদের বলব। রাজপুত্রেরা বলল—আপনার অনুগ্রহে আমরা রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে চরিতার্থ হয়েছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—যদি তাই হয় তবে এ-ও হোক—সন্ধি বিজয়ী রাজাদের আনন্দের কারণ হোক। সজ্জনের বিপদ থেকে মুক্তি হোক, পুণ্যবানদের কীর্তি আরও বর্ধিত হোক। রাজনীতি বারাঙ্গনার মতো সর্বদা মন্ত্রিগণের বক্ষে থেকে তাদের মুখচুম্বন করুক—রাজ্যে নিত্য মহোৎসব হোক।

এর সঙ্গে অতিরিক্ত এটুকুও হোক—যত দিন হিমালয়কন্যা পার্বতীর প্রিয় আবাস চন্দ্রমৌলে বিরাজিত, যত দিন বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মীর লীলা চলবে, যত দিন অক্ষয় থাকবে স্বর্ণাচল মেরু—সূর্য যার শিখা এবং দাবানলের তুল্য যার দীপ্তি ততদিন প্রচারিত থাকবে নারায়ণরচিত এই আখ্যানমালা।

সকলের শেষে এও যেন হয়—

সমৃদ্ধ রাজা ধবলচন্দ্র যিনি সযত্নে এই কাহিনী সংগ্রহ করিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন—তিনি শত্রুর উপর বিজয় লাভ করুন।

॥ নারায়ণরচিত হিতোপদেশের অনুবাদ সমাপ্ত ॥